[হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) জীবন কাহিনী]

১. হযরত আদম (আলাইহিস সালাম)

বিশ্ব ইতিহাসে প্রথম মানুষ ও প্রথম নবী হিসাবে আল্লাহ পাক আদম (আলাইহিস সালাম)-কে নিজ দু’হাত দ্বারা সরাসরি সৃষ্টি করেন (ছোয়াদ ৩৮/৭৫)। মাটির সকল উপাদানের সার-নির্যাস একত্রিত করে আঠালো ও পোড়ামাটির ন্যায় শুষ্ক মাটির তৈরী সুন্দরতম অবয়বে রূহ ফুঁকে দিয়ে আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করেছেন।[1] অতঃপর আদমের পাঁজর থেকে তাঁর স্ত্রী হাওয়াকে সৃষ্টি করেন।[2] আর এ কারণেই স্ত্রী জাতি স্বভাবগত ভাবেই পুরুষ জাতির অনুগামী ও পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট। অতঃপর স্বামী-স্ত্রীর মাধ্যমে যুগ যুগ ধরে একই নিয়মে মানববংশ বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রয়েছে। কুরআন-এর বর্ণনা অনুযায়ী প্রথম দিন থেকেই মানুষ পূর্ণ চেতনা ও জ্ঞান সম্পন্ন সভ্য মানুষ হিসাবেই যাত্রারম্ভ করেছে এবং আজও সেভাবেই তা অব্যাহত রয়েছে। অতএব গুহামানব, বন্যমানব, আদিম মানব ইত্যাদি বলে অসভ্য যুগ থেকে সভ্য যুগে মানুষের উত্তরণ ঘটেছে বলে কিছু কিছু ঐতিহাসিক যেসব কথা শুনিয়ে থাকেন, তা অলীক কল্পনা ব্যতীত কিছুই নয়। সূচনা থেকে এযাবত এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় মানুষ কখনোই মানুষ ব্যতীত অন্য কিছু ছিল না। মানুষ বানর বা উল্লুকের উদ্বর্তিত রূপ বলে ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে চার্লস ডারউইন (১৮০৯-১৮৮২) যে ‘বিবর্তনবাদ’ (Theory of Evolution) পেশ করেছেন, তা বর্তমানে একটি মৃত মতবাদ মাত্র এবং তা প্রায় সকল বিজ্ঞানী কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েছে।

প্রথম মানুষ আদি পিতা আদম (আঃ)-কে আল্লাহ সর্ব বিষয়ের জ্ঞান ও যোগ্যতা দান করেন এবং বিশ্বে আল্লাহর খেলাফত পরিচালনার মর্যাদায় অভিষিক্ত করেন। সাথে সাথে সকল সৃষ্ট বস্তুকে করে দেন মানুষের অনুগত (লোকমান ৩১/২০) ও সবকিছুর উপরে দেন মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব (ইসরা ১৭/৭০)। আর সেকারণেই জিন-ফিরিশতা সবাইকে মানুষের মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য আদমকে সিজদা করার আদেশ দেন। সবাই সে নির্দেশ মেনে নিয়েছিল। কিন্তু ইবলীস অহংকার বশে সে নির্দেশ অমান্য করায় চিরকালের মত অভিশপ্ত হয়ে যায় (বাক্বারাহ ২/৩৪)। অথচ সে ছিল বড় আলেম ও ইবাদতগুযার। সেকারণ জিন জাতির হওয়া সত্ত্বেও সে ফিরিশতাদের সঙ্গে বসবাস করার অনুমতি পেয়েছিল ও তাদের নেতা হয়েছিল।[3] কিন্তু আদমের উচ্চ মর্যাদা দেখে সে ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়ে। ফলে অহংকার বশে আদমকে সিজদা না করায় এবং আল্লাহ ভীতি না থাকায় সে আল্লাহর গযবে পতিত হয়। এজন্য জনৈক আরবী কবি বলেন,

لوكان للعلم شرف من دون التقى
لكان أشرف خلق الله إبليسُ

‘যদি তাক্বওয়া বিহীন ইলমের কোন মর্যাদা থাকত,
তবে ইবলীস আল্লাহর সৃষ্টিকুলের সেরা বলে গণ্য হ’ত’।

শয়তানের সৃষ্টি ছিল মানুষের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ :

ইবলীসকে আল্লাহ মানুষের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ সৃষ্টি করেন এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত তার হায়াত দীর্ঘ করে দেন। মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুৎ করার জন্য ও তাকে ধোঁকা দেওয়াই শয়তানের একমাত্র কাজ। ‘সে

মানুষকে বলে কুফরী কর’। কিন্তু যখন সে কুফরী করে, তখন শয়তান বলে ‘আমি তোমার থেকে মুক্ত। আমি বিশ্বপ্রভু আল্লাহকে ভয় করি’ (হাশর ৫৯/১৬)। অন্যদিকে যুগে যুগে নবী-রাসূল ও কিতাব পাঠিয়ে আল্লাহ মানুষকে সত্য পথ প্রদর্শনের ব্যবস্থা অব্যাহত রাখেন(বাক্বারাহ ২/২১৩)। আদম থেকে শুরু করে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত এক লক্ষ চবিবশ হাযার পয়গাম্বর দুনিয়াতে এসেছেন[4] এবং বর্তমানে সর্বশেষ এলাহীগ্রন্থ পবিত্র কুরআনের ধারক ও বাহক মুসলিম ওলামায়ে কেরাম শেষনবীর ‘ওয়ারিছ’ হিসাবে[5] আল্লাহ প্রেরিত অহীর বিধান সমূহ বিশ্বব্যাপী পৌঁছে দেবার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন (মায়েদাহ ৫/৬৭)। পৃথিবীর চূড়ান্ত ধ্বংস তথা ক্বিয়ামতের অব্যবহিত কাল পূর্ব পর্যন্ত এই নিয়ম জারি থাকবে। শেষনবীর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী পৃথিবীর এমন কোন বস্তি ও ঝুপড়ি ঘরও থাকবে না, যেখানে আল্লাহ ইসলামের বাণী পৌঁছে দেবেন না।[6] এতদসত্ত্বেও অবশেষে পৃথিবীতে যখন ‘আল্লাহ’ বলার মত কোন লোক থাকবে না, অর্থাৎ প্রকৃত তাওহীদের অনুসারী কোন মুমিন বাকী থাকবে না, তখন আল্লাহর হুকুমে প্রলয় ঘনিয়ে আসবে এবং ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে।[7] মানুষের দেহগুলি সব মৃত্যুর পরে মাটিতে মিশে যাবে। কিন্তু রূহগুলি স্ব স্ব ভাল বা মন্দ আমল অনুযায়ী ‘ইল্লীন’ অথবা ‘সিজ্জীনে’ অবস্থান করবে(মুত্বাফফেফীন ৮৩/৭, ১৮)। যা ক্বিয়ামতের পরপরই আল্লাহর হুকুমে স্ব স্ব দেহে পুনঃপ্রবেশ করবে (ফজর ৮৯/২৯) এবং চূড়ান্ত হিসাব-নিকাশের জন্য সকল মানুষ সশরীরে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর দরবারে নীত হবে (মুত্বাফফেফীন ৮৩/৪-৬)।

মানুষের ঠিকানা হ’ল তিনটি : ১- দারুদ দুনিয়া। অর্থাৎ যেখানে আমরা এখন বসবাস করছি ২- দারুল বরযখ। অর্থাৎ মৃত্যুর পরে কবরের জগত। ৩- দারুল ক্বারার। অর্থাৎ ক্বিয়ামতের দিন শেষ বিচার শেষে জান্নাত বা জাহান্নামের চিরস্থায়ী ঠিকানা।

অতএব পৃথিবী হ’ল মানুষের জন্য সাময়িক পরীক্ষাগার মাত্র। জান্নাত থেকে নেমে আসা মানুষ এই পরীক্ষাস্থলে পরীক্ষা শেষে সুন্দর ফল লাভে পুনরায় জান্নাতে ফিরে যাবে, অথবা ব্যর্থকাম হয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। অতঃপর সেখানেই হবে তাদের সর্বশেষ যাত্রাবিরতি এবং সেটাই হবে তাদের চূড়ান্ত ও চিরস্থায়ী ঠিকানা। আল্লাহ বলেন, ‘মাটি থেকেই আমরা তোমাদের সৃষ্টি করেছি। ঐ মাটিতেই তোমাদের ফিরিয়ে নেব। অতঃপর ঐ মাটি থেকেই আমরা তোমাদেরকে পুনরায় বের করে আনব’ (ত্বোয়াহা ২০/৫৫)। অতঃপর বিচার শেষে কাফেরদেরকে হাঁকিয়ে নেওয়া হবে জাহান্নামের দিকে এবং মুত্তাক্বীদের নেওয়া হবে জান্নাতে (যুমার ৩৯/৬৯-৭৩)। এভাবেই সেদিন যালেম তার প্রাপ্য শাস্তি ভোগ করবে এবং মযলূম তার যথাযথ প্রতিদান পেয়ে ধন্য হবে। সেদিন কারু প্রতি কোনরূপ অবিচার করা হবে না (বাক্বারাহ ২/২৮১)।

উল্লেখ্য যে, হযরত আদম (আঃ) সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের ১০টি সূরায় ৫০টি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।[8] এক্ষণে আদম সৃষ্টির ঘটনাবলী কুরআনে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, তার আলোকে সার-সংক্ষেপ আমরা তুলে ধরার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

আদম সৃষ্টির কাহিনী :

আল্লাহ একদা ফেরেশতাদের ডেকে বললেন, আমি পৃথিবীতে ‘খলীফা’ অর্থাৎ প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে চাই। বল, এ বিষয়ে তোমাদের বক্তব্য কি? তারা (সম্ভবতঃ ইতিপূর্বে সৃষ্ট জিন জাতির তিক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে) বলল, হে আল্লাহ! আপনি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে আবাদ করতে চান, যারা গিয়ে সেখানে ফাসাদ সৃষ্টি

করবে ও রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরা সর্বদা আপনার হুকুম পালনে এবং আপনার গুণগান ও পবিত্রতা বর্ণনায় রত আছি। এখানে ফেরেশতাদের উক্ত বক্তব্য আপত্তির জন্য ছিল না, বরং জানার জন্য ছিল। আল্লাহ বললেন, আমি যা জানি, তোমরা তা জানো না (বাক্বারাহ ২/৩০)। অর্থাৎ আল্লাহ চান এ পৃথিবীতে এমন একটা সৃষ্টির আবাদ করতে, যারা হবে জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন এবং নিজস্ব বিচার-বুদ্ধি ও চিন্তা-গবেষণা সহকারে স্বেচ্ছায়-সজ্ঞানে আল্লাহর বিধান সমূহের আনুগত্য করবে ও তাঁর ইবাদত করবে। ফেরেশতাদের মত কেবল হুকুম তামিলকারী জাতি নয়।

খলীফা অর্থ :

এখানে 'খলীফা' বা প্রতিনিধি বলে জিনদের পরবর্তী প্রতিনিধি হিসাবে বনু আদমকে বুঝানো হয়েছে, যারা পৃথিবীতে একে অপরের প্রতিনিধি হবে (ইবনু কাছীর)। অথবা এর দ্বারা আদম ও পরবর্তী ন্যায়নিষ্ঠ শাসকদের বুঝানো হয়েছে, যারা জনগণের মধ্যে আল্লাহর আনুগত্য ও ইনছাফপূর্ণ শাসক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করবে। কেননা ফাসাদ সৃষ্টিকারী ও অন্যায় রক্তপাতকারী ব্যক্তিরা আল্লাহর প্রতিনিধি নয় (ইবনু জারীর)। তবে প্রথম ব্যাখ্যাই অগ্রগণ্য, যা ফেরেশতাদের জবাবে প্রতীয়মান হয় যে, এমন প্রতিনিধি আপনি সৃষ্টি করবেন, যারা পূর্ববর্তী জিন জাতির মত পৃথিবীতে গিয়ে ফাসাদ ও রক্তপাত ঘটাবে। বস্ত্ততঃ 'জিন জাতির উপর ক্বিয়াস করেই তারা এরূপ কথা বলে থাকতে পারে' (ইবনু কাছীর)।

অতঃপর আল্লাহ আদমকে সবকিছুর নাম শিক্ষা দিলেন। 'সবকিছুর নাম' বলতে পৃথিবীর সূচনা থেকে লয় পর্যন্ত ছোট-বড় সকল সৃষ্টবস্ত্তর ইল্ম ও তা ব্যবহারের যোগ্যতা তাকে দিয়ে দেওয়া হ'ল।[9] যা দিয়ে সৃষ্টবস্ত্ত সমূহকে আদম ও বনু আদম নিজেদের অনুগত করতে পারে এবং তা থেকে ফায়েদা হাছিল করতে পারে। যদিও আল্লাহর অসীম জ্ঞানরাশির সাথে মানবজাতির সম্মিলিত জ্ঞানের তুলনা মহাসাগরের অথৈ জলরাশির বুক থেকে পাখির ছোঁ মারা এক ফোঁটা পানির সমতুল্য মাত্র।[10] বলা চলে যে, আদমকে দেওয়া সেই যোগ্যতা ও জ্ঞান ভান্ডার যুগে যুগে তাঁর জ্ঞানী ও বিজ্ঞানী সন্তানদের মাধ্যমে বিতরিত হচ্ছে ও তার দ্বারা জগত সংসার উপকৃত হচ্ছে। আদমকে সবকিছুর নাম শিক্ষা দেওয়ার পর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য আল্লাহ তাকে ফেরেশতাদের সম্মুখে পেশ করলেন। কুরআনে কেবল ফেরেশতাদের কথা উল্লেখিত হ'লেও সেখানে জিনদের সদস্য ইবলীসও উপস্থিত ছিল (কাহফ ১৮/৫০)। অর্থাৎ আল্লাহ চেয়েছিলেন, জিন ও ফেরেশতা উভয় সম্প্রদায়ের উপরে আদম-এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হৌক এবং বাস্তবে সেটাই হ'ল। তবে যেহেতু ফেরেশতাগণ জিনদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন, সেজন্য কেবল তাদের নাম নেওয়া হয়েছে। আর দুনিয়াতে জিনদের ইতিপূর্বেকার উৎপাত ও অনাচার সম্বন্ধে ফেরেশতারা আগে থেকেই অবহিত ছিল, সেকারণ তারা মানুষ সম্বন্ধেও একইরূপ ধারণা পোষণ করেছিল এবং প্রশ্নের জবাবে নেতিবাচক উত্তর দিয়েছিল। উল্লেখ্য যে, 'আল্লাহ জিন জাতিকে আগেই সৃষ্টি করেন গনগনে আগুন থেকে' (হিজর ১৫/২৭)। কিন্তু তারা অবাধ্যতার চূড়ান্ত করে।

আদমকে ফেরেশতাদের সম্মুখে পেশ করার পর আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে ঐসব বস্ত্তর নাম জিজ্ঞেস করলেন। কিন্তু সঙ্গত কারণেই তারা তা বলতে পারল না। তখন আল্লাহ আদমকে নির্দেশ দিলেন এবং তিনি সবকিছুর নাম বলে দিলেন। ফলে ফেরেশতারা অকপটে তাদের পরাজয় মেনে নিল এবং আল্লাহর মহত্ত্ব ও পবিত্রতা ঘোষণা করে বলল, হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে যতটুকু শিখিয়েছেন, তার বাইরে আমাদের

কোন জ্ঞান নেই। নিশ্চয়ই আপনি সর্বজ্ঞ ও দূরদৃষ্টিময়' (বাক্বারাহ ২/৩২)। অতঃপর আল্লাহ তাদের সবাইকে আদমের সম্মুখে সম্মানের সিজদা করতে বললেন। সবাই সিজদা করল, ইবলীস ব্যতীত। সে অস্বীকার করল ও অহংকারে স্ফীত হয়ে প্রত্যাখ্যান করল। ফলে সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হ'ল (বাক্বারাহ ২/৩৪)। ইবলীস ঐ সময় নিজের পক্ষে যুক্তি পেশ করে বলল, 'আমি ওর চাইতে উত্তম। কেননা আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন আর ওকে সৃষ্টি করেছেন মাটি দিয়ে'। আল্লাহ বললেন, তুই বের হয়ে যা। তুই অভিশপ্ত, তোর উপরে আমার অভিশাপ রইল পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত' (ছোয়াদ ৩৮/৭৬-৭৮; আ'রাফ ৭/১২)।

সিজদার ব্যাখ্যা ও উদ্দেশ্য :

আদমকে সৃষ্টি করার আগেই আল্লাহ ফেরেশতাদেরকে আদমের প্রতি সিজদা করার কথা বলে দিয়েছিলেন (হা-মীম সাজদাহ/ফুছছিলাত ৪১/১১)। তাছাড়া কুরআনের বর্ণনা সমূহ থেকে একথা স্পষ্ট হয় যে, আদমকে সিজদা করার জন্য আল্লাহর নির্দেশ ব্যক্তি আদম হিসাবে ছিল না, বরং ভবিষ্যৎ মানব জাতির প্রতিনিধিত্বকারী হিসাবে তাঁর প্রতি সম্মান জানানোর জন্য জিন ও ফিরিশতাদের সিজদা করতে বলা হয়েছিল। এই সিজদা কখনোই আদমের প্রতি ইবাদত পর্যায়ের ছিল না। বরং তা ছিল মানবজাতির প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন ও তাদেরকে সকল কাজে সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি দানের প্রতীকী ও সম্মান সূচক সিজদা মাত্র।

ওদিকে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হ'লেও ইবলীস কিন্তু আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা হিসাবে অস্বীকার করেনি। বরং আল্লাহ যখন তাকে 'অভিসম্পাৎ' করে জান্নাত থেকে চিরদিনের মত বিতাড়িত করলেন, তখন সে আল্লাহকে 'রব' হিসাবেই সম্বোধন করে প্রার্থনা করল, قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ- 'হে আমার প্রভু! আমাকে আপনি ক্বিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দিন' (হিজর ১৫/৩৬, ছোয়াদ ৩৮/৭৯)। আল্লাহ তার প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন। অতঃপর সে বলল, 'হে আমার পালনকর্তা! আপনি যেমন আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, আমিও তেমনি তাদের সবাইকে পৃথিবীতে নানারূপ সৌন্দর্যে প্রলুব্ধ করব এবং তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে দেব। তবে যারা আপনার একনিষ্ঠ বান্দা, তাদের ব্যতীত'(হিজর ১৫/৩৪-৪০; ছোয়াদ ৩৮/৭৯-৮৩)। আল্লাহ তাকে বললেন, তুমি নেমে যাও এবং এখান থেকে বেরিয়ে যাও। তুমি নীচুতমদের অন্তর্ভুক্ত। এখানে তোমার অহংকার করার অধিকার নেই'(আ'রাফ ৭/১৩)। উল্লেখ্য যে, ইবলীস জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হ'লেও মানুষের রগ-রেশায় ঢুকে ধোঁকা দেওয়ার ও বিভ্রান্ত করার ক্ষমতা আল্লাহ তাকে দিয়েছিলেন।[11] আর এটা ছিল মানুষের পরীক্ষার জন্য। শয়তানের ধোঁকার বিরুদ্ধে জিততে পারলেই মানুষ তার শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারবে এবং আখেরাতে জান্নাত লাভে ধন্য হবে। নইলে ইহকাল ও পরকালে ব্যর্থকাম হবে। মানুষের প্রতি ফেরেশতাদের সিজদা করা ও ইবলীসের সিজদা না করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে এ বিষয়ে যে, মানুষ যেন প্রতি পদে পদে শয়তানের ব্যাপারে সতর্ক থাকে এবং আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের মাধ্যমে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখে।

আদমের পাঁচটি শ্রেষ্ঠত্ব :

(১) আল্লাহ তাকে নিজ দু'হাতে সৃষ্টি করেছেন (ছোয়াদ ৩৮/৭৫)। (২) আল্লাহ নিজে তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দিয়েছেন (ছোয়াদ ৩৮/৭২)। (৩) আল্লাহ তাকে সকল বস্তুর নাম শিক্ষা দিয়েছেন (বাক্বারাহ ২/৩১)। (৪) তাকে সিজদা করার জন্য আল্লাহ ফেরেশতাদের নির্দেশ দিয়েছেন (বাক্বারাহ ২/৩৪)। (৫) আদম একাই মাত্র

মাটি থেকে সৃষ্ট। বাকী সবাই পিতা-মাতার মাধ্যমে সৃষ্ট (সাজদাহ ৩২/৭-৯)।

ইবলীসের অভিশপ্ত হওয়ার কারণ ছিল তার ক্বিয়াস। সে আল্লাহর আদেশের বিরুদ্ধে যুক্তি পেশ করে বলেছিল, 'আমি আদমের চাইতে উত্তম। কেননা আপনি আমাকে আগুন দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি দয়ে' (হিজর ২৯)। মুহাম্মাদ ইবনু সীরীন বলেন, اول من قاس ابليس'প্রথম ক্বিয়াস করেছিল ইবলীস'। হাসান বছরীও অনুরূপ বলেছেন।[12]

নারী জাতি পুরুষেরই অংশ এবং তার অনুগত :

সিজদা অনুষ্ঠানের পর আল্লাহ আদমের জুড়ি হিসাবে তার অবয়ব হ'তে একাংশ নিয়ে অর্থাৎ তার পাঁজর হ'তে তার স্ত্রী হাওয়াকে সৃষ্টি করলেন[13] মাটি থেকে সৃষ্ট হওয়া আদমের নাম হ'ল 'আদম' এবং জীবন্ত আদমের পাঁজর হ'তে সৃষ্ট হওয়ায় তাঁর স্ত্রীর নাম হ'ল 'হাওয়া' (কুরতুবী)। অতঃপর তাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ বললেন, 'তোমরা দু'জন জান্নাতে বসবাস কর ও সেখান থেকে যা খুশী খেয়ে বেড়াও। তবে সাবধান! এই গাছটির নিকটে যেয়ো না। তাহ'লে তোমরা সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে' (বাক্বারাহ ২/৩৫)। এতে বুঝা যায় যে, ফেরেশতাগণের সিজদা কেবল আদমের জন্য ছিল, হাওয়ার জন্য নয়। দ্বিতীয়তঃ সিজদা অনুষ্ঠানের পরে আদমের অবয়ব থেকে হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়, পূর্বে নয়। তিনি পৃথক কোন সৃষ্টি ছিলেন না। এতে পুরুষের প্রতি নারীর অনুগামী হওয়া প্রমাণিত হয়। আল্লাহ বলেন, 'পুরুষেরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল' (নিসা ৪/৩৪)। অতঃপর বহিষ্কৃত ইবলীস তার প্রথম টার্গেট হিসাবে আদম ও হাওয়ার বিরুদ্ধে প্রতারণার জাল নিক্ষেপ করল। সেমতে সে প্রথমে তাদের খুব আপনজন বনে গেল এবং নানা কথায় তাদের ভুলাতে লাগল। এক পর্যায়ে সে বলল, 'আল্লাহ যে তোমাদেরকে ঐ গাছটির নিকটে যেতে নিষেধ করেছেন, তার কারণ হ'ল এই যে, তোমরা তাহ'লে ফেরেশতা হয়ে যাবে কিংবা তোমরা এখানে চিরস্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যাবে' (আ'রাফ ৭/২০)। সে অতঃপর কসম খেয়ে বলল যে, আমি অবশ্যই তোমাদের হিতাকাংখী'(ঐ, ২১)। 'এভাবেই সে আদম ও হাওয়াকে সম্মত করে ফেলল এবং তার প্রতারণার জালে আটকে গিয়ে তারা উক্ত নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল আস্বাদন করল। ফলে সাথে সাথে তাদের গুপ্তাঙ্গ প্রকাশিত হয়ে পড়ল এবং তারা তড়িঘড়ি গাছের পাতা সমূহ দিয়ে তা ঢাকতে লাগল। আল্লাহ তাদেরকে ডেকে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে এ বৃক্ষ থেকে নিষেধ করিনি এবং বলিনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? (ঐ, ২২) তখন তারা অনুতপ্ত হ'য়ে বলল, قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ- 'হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা নিজেদের উপর যুলুম করেছি। যদি আপনি আমাদের ক্ষমা না করেন, তবে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব' (২৩)। 'আল্লাহ তখন বললেন, তোমরা (জান্নাত থেকে) নেমে যাও। তোমরা একে অপরের শত্রু। তোমাদের অবস্থান হবে পৃথিবীতে এবং সেখানেই তোমরা একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত সম্পদরাজি ভোগ করবে' (২৪)। তিনি আরও বললেন যে, 'তোমরা পৃথিবীতেই জীবনযাপন করবে, সেখানেই মৃত্যুবরণ করবে এবং সেখান থেকেই তোমরা পুনরুত্থিত হবে' (আ'রাফ ৭/২০-২৫)।

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ইবলীসের কথায় সর্বপ্রথম হাওয়া প্রতারিত হন। অতঃপর তার মাধ্যমে আদম প্রতারিত হন বলে যে কথা চালু আছে কুরআনে এর কোন সমর্থন নেই। ছহীহ হাদীছেও স্পষ্ট কিছু নেই। এ বিষয়ে তাফসীরে ইবনু জারীরে ইবনু আববাস (রাঃ) থেকে যে বর্ণনা এসেছে, তা যঈফ।[14] দ্বিতীয়তঃ জান্নাত থেকে অবতরণের নির্দেশ তাদের অপরাধের শাস্তি স্বরূপ ছিলনা। কেননা এটা

ছিল তওবা কবুলের পরের ঘটনা। অতএব এটা ছিল হয়তবা তাকে শিষ্টাচার শিক্ষা দানের জন্য। বরং সঠিক কথা এই যে, এটা ছিল আল্লাহর পূর্ব নির্ধারিত ও দূরদর্শী পরিকল্পনারই অংশ। কেননা জান্নাত হ'ল কর্মফল লাভের স্থান, কর্মের স্থান নয়। তাছাড়া জান্নাতে মানুষের বংশ বৃদ্ধির সুযোগ নেই। এজন্য দুনিয়ায় নামিয়ে দেওয়া যরূরী ছিল।

প্রথম বার আদেশ দানের পরে পুনরায় স্নেহ ও অনুগ্রহ মিশ্রিত আদেশ দিয়ে বললেন, 'তোমরা সবাই নেমে যাও'। অতঃপর পৃথিবীতে আল্লাহর খলীফা হওয়ার (বাক্বারাহ ২/৩০; ফাত্বির ৩৫/৩৯)মহান মর্যাদা প্রদান করে বললেন, 'তোমাদের নিকটে আমার পক্ষ থেকে হেদায়াত অবতীর্ণ হবে। যারা তার অনুসরণ করবে, তাদের জন্য কোন ভয় বা চিন্তার কারণ থাকবে না। কিন্তু যারা তা প্রত্যাখ্যান করবে ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে, তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী এবং সেখানে তারা অনন্তকাল ধরে অবস্থান করবে' (বাক্বারাহ ২/৩৮-৩৯)।

উল্লেখ্য যে, নবীগণ ছিলেন নিষ্পাপ এবং হযরত আদম (আঃ) ছিলেন নিঃসন্দেহে নিষ্পাপ। তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ভুল করেননি। বরং শয়তানের প্ররোচনায় প্রতারিত হয়ে তিনি সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ বৃক্ষের নিকটবর্তী হওয়ার নিষেধাজ্ঞার কথাটি ভুলে গিয়েছিলেন। যেমন অন্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا 'অতঃপর আদম ভুলে গেল এবং আমি তার মধ্যে (সংকল্পের) দৃঢ়তা পাইনি' (ত্বোয়াহা ২০/১১৫)। তাছাড়া উক্ত ঘটনার সময় তিনি নবী হননি বরং পদস্খলনের ঘটনার পরে আল্লাহ তাকে নবী মনোনীত করে দুনিয়ায় পাঠান ও হেদায়াত প্রদান করেন' (আ'রাফ ৭/১২২)।

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, ইবলীসের ক্ষেত্রে আল্লাহ বললেন, قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ 'তুমি জান্নাত থেকে বেরিয়ে যাও। নিশ্চয়ই তুমি অভিশপ্ত' (হিজর ১৫/৩৪; আ'রাফ ৭/১৮)। অন্যদিকে আদম ও হাওয়ার ক্ষেত্রে বললেন, قُلْنَا اهْبِطُواْ مِنْهَا ' তোমরা নেমে যাও' (বাক্বারাহ ২/৩৬, ৩৮; আ'রাফ ৭/২৪)। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইবলীস কখনোই আর জান্নাতে ফিরে আসতে পারবে না। কিন্তু বনু আদমের ঈমানদারগণ পুনরায় ফিরে আসতে পারবে ইনশাআল্লাহ।

নগ্নতা শয়তানের প্রথম কাজ :

মানুষের উপরে শয়তানের প্রথম হামলা ছিল তার দেহ থেকে কাপড় খসিয়ে তাকে উলঙ্গ করে দেওয়া। আজও পৃথিবীতে শয়তানের পদাংক অনুসারী ও ইবলীসের শিখন্ডীদের প্রথম কাজ হ'ল তথাকথিত ক্ষমতায়ন ও লিঙ্গ সমতার নামে নারীকে উলঙ্গ করে ঘরের বাইরে আনা ও তার সৌন্দর্য উপভোগ করা। অথচ পৃথিবীর বিগত সভ্যতাগুলি ধ্বংস হয়েছে মূলতঃ নারী ও মদের সহজলভ্যতার কারণেই। অতএব সভ্য-ভদ্র ও আল্লাহভীরু বান্দাদের নিকটে ঈমানের পর সর্বপ্রথম ফরয হ'ল স্ব স্ব লজ্জাস্থান আবৃত রাখা ও ইযযত-আবরূর হেফাযত করা। অন্যান্য ফরয সবই এর পরে। নারীর পর্দা কেবল পোষাকে হবে না, বরং তা হবে তার ভিতরে, তার কথা-বার্তায়, আচার-আচরণে ও চাল-চলনে সর্ব বিষয়ে। পরনারীর প্রতিটি অঙ্গভঙ্গি ও মিষ্ট কণ্ঠস্বর পরপুরুষের হৃদয়ে অন্যায় প্রভাব বিস্তার করে। অতএব লজ্জাশীলতাই মুমিন নর-নারীর অঙ্গভূষণ ও পারস্পরিক নিরাপত্তার গ্যারান্টি। নারী ও পুরুষ প্রত্যেকে একে অপরের থেকে স্ব স্ব দৃষ্টিকে অবনত রাখবে (নূর ২৪/৩০-৩১) এবং পরস্পরে সার্বিক পর্দা বজায় রেখে কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় কথাটুকু স্বাভাবিকভাবে সংক্ষেপে বলবে। নারী ও পুরুষ প্রত্যেকে নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য ও পর্দা বজায় রেখে স্ব স্ব কর্মস্থলে ও কর্মপরিধির মধ্যে স্বাধীনভাবে কাজ করবে এবং সংসার ও সমাজের কল্যাণে সাধ্যমত অবদান রাখবে।

নেগেটিভ ও পজেটিভ পাশাপাশি বিদ্যুৎবাহী দু’টি ক্যাবলের মাঝে প্লাষ্টিকের আবরণ যেমন পর্দার কাজ করে এবং অপরিহার্য এক্সিডেন্ট ও অগ্নিকান্ড থেকে রক্ষা করে, অনুরূপভাবে পরনারী ও পরপুরুষের মধ্যকার পর্দা উভয়ের মাঝে ঘটিতব্য যেকোন অনাকাংখিত বিষয় থেকে পরস্পরকে হেফাযত করে। অতএব শয়তানের প্ররোচনায় জান্নাতের পবিত্র পরিবেশে আদি পিতা-মাতার জীবনে ঘটিত উক্ত অনিচ্ছাকৃত দুর্ঘটনা থেকে দুনিয়ার এই পঙ্কিল পরিবেশে বসবাসরত মানব জাতিকে আরও বেশী সতর্ক ও সাবধান থাকা উচিত। কুরআন ও হাদীছ আমাদেরকে সেদিকেই হুঁশিয়ার করেছে।

মানব সৃষ্টির রহস্য :

আল্লাহ বলেন, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّيْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُوْنٍ، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِن رُّوحِيْ فَقَعُوْا لَهُ سَاجِدِيْنَ- ‘স্মরণ কর সেই সময়ের কথা, যখন তোমার প্রভু ফেরেশতাদের বললেন, আমি মিশ্রিত পচা কাদার শুকনো মাটি দিয়ে ‘মানুষ’ সৃষ্টি করব। অতঃপর যখন আমি তার অবয়ব পূর্ণভাবে তৈরী করে ফেলব ও তাতে আমি আমার রূহ ফুঁকে দেব, তখন তোমরা তার প্রতি সিজদায় পড়ে যাবে’ (হিজর ১৫/২৮-২৯)। অন্যত্র তিনি বলেন, هُوَ الَّذِيْ يُصَوِّرُكُمْ فِي الأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ لآ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ- (آل عمران ৬)- ‘তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমাদেরকে মাতৃগর্ভে আকার-আকৃতি দান করেছেন যেমন তিনি চেয়েছেন। তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি মহা পরাক্রান্ত ও মহা বিজ্ঞানী’ (আলে ইমরান ৩/৬)। তিনি আরও বলেন, يَخْلُقُكُمْ فِيْ بُطُوْنِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلاَثٍ- (زمر ৬)- ‘তিনি তোমাদেরকে তোমাদের মাতৃগর্ভে সৃষ্টি করেন একের পর এক স্তরে তিনটি অন্ধকারাচ্ছন্ন আবরণের মধ্যে’ (যুমার ৩৯/৬)। তিনটি আবরণ হ’ল- পেট, রেহেম বা জরায়ু এবং জরায়ুর ফুল বা গর্ভাধার।

উপরোক্ত আয়াতগুলিতে আদম সৃষ্টির তিনটি পর্যায় বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমে মাটি দ্বারা অবয়ব নির্মাণ, অতঃপর তার আকার-আকৃতি গঠন ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমূহে শক্তির আনুপতিক হার নির্ধারণ ও পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান এবং সবশেষে তাতে রূহ সঞ্চার করে আদমকে অস্তিত্ব দান। অতঃপর আদমের অবয়ব (পাঁজর) থেকে কিছু অংশ নিয়ে তার জোড়া বা স্ত্রী সৃষ্টি করা। সৃষ্টির সূচনা পর্বের এই কাজগুলি আল্লাহ সরাসরি নিজ হাতে করেছেন (ছোয়াদ ৩৮/৭৫)। অতঃপর এই পুরুষ ও নারী স্বামী-স্ত্রী হিসাবে বসবাস করে প্রথম যে যমজ সন্তান জন্ম দেয়, তারাই হ’ল মানুষের মাধ্যমে সৃষ্ট পৃথিবীর প্রথম মানব যুগল। তারপর থেকে এযাবত স্বামী-স্ত্রীর মিলনে মানুষের বংশ বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে।

শুধু মানুষ নয়, উদ্ভিদরাজি, জীবজন্তু ও প্রাণীকুলের সৃষ্টি হয়েছে মাটি থেকে। আর মাটি সৃষ্টি হয়েছে পানি থেকে। পানিই হ’ল সকল জীবন্ত বস্ত্তর মূল (ফুরক্বান ২৫/৫৪)।

মৃত্তিকাজাত সকল প্রাণীর জীবনের প্রথম ও মূল একক (Unit) হচ্ছে ‘প্রোটোপ্লাজম’ (Protoplasm)। যাকে বলা হয় ‘আদি প্রাণসত্তা’। এ থেকেই সকল প্রাণী সৃষ্টি হয়েছে। এজন্য বিজ্ঞানী মরিস বুকাইলী একে Bomb shell বলে অভিহিত করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে মাটির সকল প্রকারের রাসায়নিক উপাদান। মানুষের জীবন বীজে প্রচুর পরিমাণে চারটি উপাদান পাওয়া যায়। অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন ও হাইড্রোজেন। আর আটটি পাওয়া যায় সাধারণভাবে সমপরিমাণে। সেগুলি হ’ল- ম্যাগনেশিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, ক্লোরিন, সালফার ও আয়রণ। আরও আটটি পদার্থ পাওয়া যায় স্বল্প

পরিমাণে। তাহ'ল: সিলিকন, মোলিবডেনাম, ফ্লুরাইন, কোবাল্ট, ম্যাঙ্গানিজ, আয়োডিন, কপার ও যিংক। কিন্তু এই সব উপাদান সংমিশ্রিত করে জীবনের কণা তথা 'প্রোটোপ্লাজম' তৈরী করা সম্ভব নয়। জনৈক বিজ্ঞানী দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে এসব মৌল উপাদান সংমিশ্রিত করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছেন এবং তাতে কোন জীবনের 'কণা' পরিলক্ষিত হয়নি। এই সংমিশ্রণ ও তাতে জীবন সঞ্চার আল্লাহ ব্যতীত কারু পক্ষে সম্ভব নয়। বিজ্ঞান এক্ষেত্রে মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছে।

প্রথম পর্যায়ে মাটি থেকে সরাসরি আদমকে অতঃপর আদম থেকে তার স্ত্রী হাওয়াকে সৃষ্টি করার পরবর্তী পর্যায়ে আল্লাহ আদম সন্তানদের মাধ্যমে বনু আদমের বংশ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করেছেন। এখানেও রয়েছে সাতটি স্তর। যেমন: মৃত্তিকার সারাংশ তথা প্রোটোপ্লাজম, বীর্য বা শুক্রকীট, জমাট রক্ত, মাংসপিন্ড, অস্থিমজ্জা, অস্থি পরিবেষ্টনকারী মাংস এবং সবশেষে রূহ সঞ্চারণ (মুমিনূন ২৩/১২-১৪; মুমিন ৪০/৬৭; ফুরক্বান ২৫/৪৪; তারেক্ব ৮৬/৫-৭)। স্বামীর শুক্রকীট স্ত্রীর জরায়ুতে রক্ষিত ডিম্বকোষে প্রবেশ করার পর উভয়ের সংমিশ্রিত বীর্যে সন্তান জন্ম গ্রহণ করে(দাহর ৭৬/২)। উল্লেখ্য যে, পুরুষের একবার নির্গত লম্ফমান বীর্যে লক্ষ-কোটি শুক্রাণু থাকে। আল্লাহর হুকুমে তন্মধ্যকার একটি মাত্র শুক্রকীট স্ত্রীর জরায়ুতে প্রবেশ করে। এই শুক্রকীট পুরুষ ক্রোমোজম Y অথবা স্ত্রী ক্রোমোজম X হয়ে থাকে। এর মধ্যে যেটি স্ত্রীর ডিম্বের X ক্রোমোজমের সাথে মিলিত হয়, সেভাবেই পুত্র বা কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করে আল্লাহর হুকুমে।

মাতৃগর্ভের তিন তিনটি গাঢ় অন্ধকার পর্দার অন্তরালে এইভাবে দীর্ঘ নয় মাস ধরে বেড়ে ওঠা প্রথমত: একটি পূর্ণ জীবন সত্তার সৃষ্টি, অতঃপর একটি জীবন্ত প্রাণবন্ত ও প্রতিভাবান শিশু হিসাবে দুনিয়াতে ভূমিষ্ট হওয়া কতই না বিস্ময়কর ব্যাপার। কোন মানুষের পক্ষে এই অনন্য-অকল্পনীয় সৃষ্টিকর্ম আদৌ সম্ভব কী? মাতৃগর্ভের ঐ অন্ধকার গৃহে মানবশিশু সৃষ্টির সেই মহান কারিগর কে? কে সেই মহান আর্কিটেক্ট, যিনি ঐ গোপন কুঠরীতে পিতার ২৩টি ক্রোমোজম ও মাতার ২৩টি ক্রোমোজম একত্রিত করে সংমিশ্রিত বীর্য প্রস্ত্তত করেন? কে সেই মহান শিল্পী, যিনি রক্তপিন্ড আকারের জীবন টুকরাটিকে মাতৃগর্ভে পুষ্ট করেন? অতঃপর ১২০ দিন পরে তাতে রূহ সঞ্চার করে তাকে জীবন্ত মানব শিশুতে পরিণত করেন এবং পূর্ণ-পরিণত হওয়ার পরে সেখান থেকে বাইরে ঠেলে দেন (আবাসা ৮০/১৮-২০)। বাপ-মায়ের স্বপ্নের ফসল হিসাবে নয়নের পুত্তলি হিসাবে? মায়ের গর্ভে মানুষ তৈরীর সেই বিস্ময়কর যন্ত্রের দক্ষ কারিগর ও সেই মহান শিল্পী আর কেউ নন, তিনি আল্লাহ! সুবহানাল্লাহি ওয়া বেহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আযীম!!

পুরুষ ও নারীর সংমিশ্রিত বীর্যে সন্তান জন্ম লাভের তথ্য কুরআনই সর্বপ্রথম উপস্থাপন করেছে (দাহর ৭৬/২)। আধুনিক বিজ্ঞান এ তথ্য জনতে পেরেছে মাত্র গত শতাব্দীতে ১৮৭৫ সালে ও ১৯১২ সালে। তার পূর্বে এরিষ্টটল সহ সকল বিজ্ঞানীর ধারণা ছিল যে, পুরুষের বীর্যের কোন কার্যকারিতা নেই। রাসূলের হাদীছ বিজ্ঞানীদের এই মতকে সম্পূর্ণ বাতিল ঘোষণা করেছে।[15]কেননা সেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে সন্তান প্রজননে পুরুষ ও নারী উভয়ের বীর্য সমানভাবে কার্যকর।

উল্লেখ্য যে, মাতৃগর্ভে বীর্য প্রথম ৬ দিন কেবল বুদ্বুদ আকারে থাকে। তারপর জরায়ুতে সম্পর্কিত হয়। তিন মাসের আগে ছেলে বা মেয়ে সন্তান চিহ্নিত হয় না। চার মাস পর রূহ সঞ্চারিত হয়ে বাচ্চা নড়েচড়ে ওঠে ও আঙ্গুল চুষতে থাকে। যাতে ভূমিষ্ট হওয়ার পরে মায়ের স্তন চুষতে অসুবিধা না হয়। এ সময় তার কপালে চারটি বস্ত্ত লিখে দেওয়া হয়। তার আজাল (হায়াত), আমল, রিযিক এবং সে ভাগ্যবান না দুর্ভাগা।[16]

এভাবেই জগত সংসারে মানববংশ বৃদ্ধির ধারা এগিয়ে চলেছে। এ নিয়মের ব্যতিক্রম নেই কেবল আল্লাহর হুকুম ব্যতীত। একারণেই আল্লাহ অহংকারী মানুষকে উদ্দেশ্য করে বলেন, ‘মানুষ কি দেখে না যে, আমরা তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্রবিন্দু থেকে? অতঃপর সে হয়ে গেল প্রকাশ্যে বিতন্ডাকারী’। ‘সে আমাদের সম্পর্কে নানারূপ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে। অথচ সে নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে ভুলে যায়, আর বলে যে, কে জীবিত করবে এসব হাড়গোড় সমূহকে, যখন সেগুলো পচে গলে যাবে? (ইয়াসীন ৩৬/৭৭-৭৮)।

জান্নাত থেকে পতিত হবার পর :

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) থেকে ছহীহ সনদে ইমাম আহমাদ, নাসাঈ ও হাকেম (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ‘আমি কি তোমাদের প্রভু নই’? বনু আদমের কাছ থেকে এই বহুল প্রসিদ্ধ ‘আহদে আলাস্তু’ বা প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতিটি তখনই নেওয়া হয়, যখন আদম (আঃ)-কে জান্নাত থেকে পৃথিবীতে নামিয়ে দেওয়া হয়। আর এ প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়েছিল না‘মান (وادى نَعْمَانَ)নামক উপত্যকায়, যা পরবর্তীকালে ‘আরাফাত’-এর ময়দান নামে পরিচিত হয়েছে।[17]এর দ্বারা একটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, জান্নাত ও জাহান্নামের অবস্থান পৃথিবীর বাইরে অন্যত্র এবং তা সৃষ্ট অবস্থায় তখনও ছিল এখনও আছে। আধুনিক বিজ্ঞান এ পৃথিবী ও সৌরলোকের বাইরে দূরে বহুদূরে অগণিত সৌরলোকের সন্ধান দিয়ে কুরআন ও হাদীছের তথ্যকেই সপ্রমাণ করে দিচ্ছে।

আদমের অবতরণ স্থল :

আদম ও হাওয়াকে আসমানে অবস্থিত জান্নাত থেকে নামিয়ে দুনিয়ায় কোথায় রাখা হয়েছিল, সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। যেমন বলা হয়েছে আদমকে সরনদীপে (শ্রীলংকা) ও হাওয়াকে জেদ্দায় (সঊদী আরব) এবং ইবলীসকে বছরায় (ইরাক) ও ইবলাসের জান্নাতে ঢোকার কথিত বাহন সাপকে ইস্ফাহানে (ইরান) নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কেউ বলেছেন, আদমকে মক্কার ছাফা পাহাড়ে এবং হাওয়াকে মারওয়া পাহাড়ে নামানো হয়েছিল। এছাড়া আরও বক্তব্য এসেছে। তবে যেহেতু কুরআন ও ছহীহ হাদীছে এ বিষয়ে স্পষ্ট কিছু বলা হয়নি, সেকারণ এ বিষয়ে আমাদের চুপ থাকাই শ্রেয়।

‘আহদে আলাস্তু-র বিবরণ :

মুসলিম ইবনে ইয়াসার (রাঃ) বলেন, কিছু লোক হযরত ওমর ফারূক (রাঃ)-এর নিকটে সূরা আ‘রাফ ১৭২ আয়াতের মর্ম জানতে চাইলে তিনি বলেন, এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে প্রশ্ন করা হ’লে তাঁকে আমি বলতে শুনেছি যে, ‘আল্লাহ তা‘আলা আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেন।[18]অতঃপর নিজের ডান হাত তার পিঠে বুলিয়ে দিলেন। তখন তার ঔরসে যত সৎ মানুষ জন্মাবার ছিল, তারা সব বেরিয়ে এল। আল্লাহ বললেন, এদেরকে আমি জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেছি এবং এরা দুনিয়াতে জান্নাতেরই কাজ করবে। অতঃপর তিনি পুনরায় তার পিঠে হাত বুলালেন, তখন সেখান থেকে একদল সন্তান বের করে আনলেন এবং বললেন, এদেরকে আমি জাহান্নামের জন্যে সৃষ্টি করেছি। এরা দুনিয়াতে জাহান্নামের কাজই করবে। একথা শুনে জনৈক ছাহাবী প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাহ’লে আর আমল করানোর উদ্দেশ্য কি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, যখন আল্লাহ কাউকে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি করেন, তখন তিনি তাকে দিয়ে জান্নাতের কাজই করিয়ে নেন, এমনকি তার মৃত্যুও অনুরূপ কাজের মধ্যে হয়ে থাকে। অতঃপর আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান। পক্ষান্তরে যখন তিনি কাউকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেন, তখন তাকে দিয়ে জাহান্নামের কাজই করিয়ে নেন। এমনকি তার

মৃত্যুও অনুরূপ কাজের মধ্যে হয়ে থাকে। অতঃপর আল্লাহ তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করান।[19] আবুদ্দারদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ডান মুষ্টির লোকগুলো ছিল সুন্দর চকচকে ক্ষুদ্র পিপীলিকা দলের ন্যায়। আর বাম মুষ্টির ক্ষুদ্র লোকগুলো ছিল কালো কয়লার ন্যায়'।[20]

উল্লেখ্য যে, কুরআনে বলা হয়েছে, 'বনু আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে' (আ'রাফ ১৭২)। অন্যদিকে হাদীছে বলা হয়েছে, 'আদমের পৃষ্ঠদেশ' থেকে- মূলতঃ উভয়ের মধ্যে কোন বৈপরিত্য নেই। আদম যেহেতু বনু আদমের মূল এবং আদি পিতা, সেহেতু তাঁর পৃষ্ঠদেশ বলা আর বনু আদমের পৃষ্ঠদেশ বলা একই কথা। তাছাড়া আদমের দেহের প্রতিটি লোমকূপ থেকে অসংখ্য বনু আদমকে বের করে এনে উপস্থিত করানো আল্লাহর জন্য বিচিত্র কিছুই নয়।

মানুষ যেহেতু তার ভাগ্য সম্পর্কে জানে না, সেহেতু তাকে সর্বদা জান্নাত লাভের আশায় উক্ত পথেই কাজ করে যেতে হবে। সাধ্যমত চেষ্টা সত্ত্বেও ব্যর্থ হ'লে বুঝতে হবে যে, ওটাই তার তাকদীরের লিখন ছিল। বান্দাকে ভাল ও মন্দ দু'টি করারই স্বাধীন এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। আর এই ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের স্বাধীনতার কারণেই বনু আদম আল্লাহর সেরা সৃষ্টির মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছে। আর একারণেই তাকে তার ভাল ও মন্দ কাজের পরিণতি ভোগ করতে হয়।

এখানে আদমের ঔরস বলতে আদম ও তার ভবিষ্যৎ সন্তানদের ঔরস বুঝানো হয়েছে। এখানে 'বংশধর' বলতে তাদের অশরীরী আত্মাকে বুঝানো হয়নি, বরং আত্মা ও দেহের সমন্বয়ে জ্ঞান ও চেতনা সম্পন্ন ক্ষুদ্র অবয়ব সমূহকে বুঝানো হয়েছে, যাদের কাছ থেকে সেদিন সজ্ঞানে তাদের প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়েছিল। আর এটা আল্লাহর জন্য খুবই সহজ। আজকের বিজ্ঞান একটা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণুর ভিতরে গোটা সৌরমন্ডলীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছে। ফিল্মের মাধ্যমে একটি বিরাটকায় বস্তুকে একটি ছোট্ট বিন্দুর আয়তনে দেখানো হচ্ছে। কাজেই আল্লাহ তা'আলা যদি উক্ত অঙ্গীকার অনুষ্ঠানে সকল আদম সন্তানকে জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন করে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দেহে অণু-বিন্দুতে অস্তিত্ব দান করে থাকেন, তবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তাছাড়া জ্ঞানসম্পন্ন না হ'লে এবং বিষয়টি তাদের অনুধাবনে ও উপলব্ধিতে না আসলে এ ধরনের প্রতিশ্রুতি গ্রহণের ও অঙ্গীকার ঘোষণার কোন গুরুত্ব থাকে না।

প্রশ্ন হ'তে পারে যে, সৃষ্টির সূচনায় গৃহীত এই প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতির কথা পরবর্তীতে মানুষের ভুলে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। তাহ'লে এ ধরনের প্রতিশ্রুতি গ্রহণের ফলাফলটা কি? এর জবাব এই যে, আদি পিতা-মাতা আদম-হাওয়ার রক্ত ও মানসিকতার প্রভাব যেমন যুগে-যুগে দেশে-দেশে সকল ভাষা ও বর্ণের মানুষের মধ্যে সমভাবে পরিদৃষ্ট হয়, তেমনিভাবে সেদিনে গৃহীত তাওহীদের স্বীকৃতি ও প্রতিশ্রুতির প্রভাব সকল মানুষের মধ্যেই কমবেশী বিদ্যমান রয়েছে। মানুষের অস্তিত্বই মানুষকে তার সৃষ্টিকর্তার সন্ধান দেয় ও বিপন্ন অবস্থায় তার কাছে আশ্রয় গ্রহণের জন্য তার হৃদয় ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

তাই তো দেখা গেছে, বিশ্ব ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম শাসক ও আল্লাহদ্রোহী ফেরাঊন ডুবে মরার সময় চীৎকার দিয়ে আল্লাহর উপরে তার বিশ্বাস ঘোষণা করেছিল' (ইউনুস ১০/৯০-৯১)। মক্কা-মদীনার কাফের-মুশরিকরা শেষনবীর সাথে শত্রুতা পোষণ করলেও কখনো আল্লাহকে অস্বীকার করেনি। আধুনিক বিশ্বের নাস্তিকসেরা স্ট্যালিনকে পর্যন্ত শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের পূর্ব মুহূর্তে 'ওহ মাই গড' বলে চীৎকার করে উঠতে শোনা গেছে। প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টির সূচনালগ্নে গৃহীত উক্ত স্বীকারোক্তি প্রত্যেকটি মানুষের হৃদয়ে আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি

বিশ্বাসের বীজ বপন করে দিয়েছে। চাই তার বিকাশ কোন শিরকী ও ভ্রান্ত পদ্ধতিতে হৌক বা নবীদের দেখানো সঠিক তাওহীদী পদ্ধতিতে হৌক।

এ কথাটাই হাদীছে এসেছে এভাবে যে, مَامِنْ مَوْلُوْدٍ إِلاَّ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبْوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ... ‘প্রত্যেক মানবশিশুই ফিৎরাতের উপরে জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী-নাছারা বা মজূসী (অগ্নিউপাসক) বানায়’।[21] এখানে ‘ফিৎরাত’ অর্থ স্বভাবধর্ম ইসলাম।[22] অর্থাৎ মানব শিশু কোন শিরকী ও কুফরী চেতনা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না। বরং আল্লাহকে চেনা ও তার প্রতি আনুগত্য ও আত্মসমর্পণের চেতনা ও যোগ্যতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এর ফলে নবীদের প্রদত্ত তাওহীদের শিক্ষাকে সে অত্যন্ত সহজে ও সাগ্রহে বরণ করে নেয়। কেননা শুধু জন্মগত চেতনার কারণেই কেউ মুসলমান হ’তে পারে না। যতক্ষণ না সে নবীর মাধ্যমে প্রেরিত দ্বীন সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় কবুল করে।

ছহীহ মুসলিমের অপর বর্ণনায় এসেছে, وَإِنِّىْ خَلَقْتُ عِبَادِيْ حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ وَأَنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِيْنُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِيْنِهِمْ... ‘আল্লাহ বলেছেন, যে আমি আমার বান্দাদের ‘হানীফ’ অর্থাৎ ‘আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ’ রূপে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর শয়তান তার পিছে লেগে তাকে আল্লাহর পথ থেকে দূরে নিয়ে গেছে।[23]আল্লাহ বলেন, فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ‘আল্লাহর ফিৎরত, যার উপরে তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর এই সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই’ (রূম ৩০/৩০)। মোট কথা প্রত্যেক মানবশিশু স্বভাবধর্ম ইসলামের উপরে জন্মগ্রহণ করে এবং নিজ সৃষ্টিকর্তাকে চেনার ও তাকে মেনে চলার অনুভূতি ও যোগ্যতা নিয়ে সৃষ্টি হয়। যদিও পিতা-মাতা ও পরিবেশের কারণে কিংবা শয়তানের ওয়াসওয়াসায় পরবর্তীতে অনেকে বিভ্রান্ত হয়। অতএব কাফির-মুমিন-মুশরিক সবার মধ্যে আল্লাহকে চেনার ও তাঁর ইবাদত ও আনুগত্যের চেতনা ও যোগ্যতা বিদ্যমান রয়েছে। এই সৃষ্টিগত চেতনা ও অনুভূতিকে কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। অর্থাৎ কুশিক্ষা, কুসঙ্গ ও শয়তানী সাহিত্য পাঠ করে বা নষ্ট ব্লু ফিল্মের নীল দংশনে উক্ত চেতনাকে পরিবর্তনের চেষ্টা করা আল্লাহর সৃষ্টির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার শামিল। অতএব উক্ত সৃষ্টিগত চেতনাকে সমুন্নত রাখাই ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্তব্য।

একথা ব্যক্ত করে আল্লাহ বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ- ‘আমি জিন ও ইনসানকে আমার ইবাদত ব্যতীত অন্য কোন কাজের জন্য সৃষ্টি করিনি’ (যারিয়াত ৫১/৫৬)। অর্থাৎ আমি তার প্রকৃতিতে আমার প্রতি ইবাদত ও দাসত্বের আগ্রহ ও যোগ্যতা সৃষ্টি করে দিয়েছি। এটাকে সঠিক অর্থে কাজে লাগালে আমার অবাধ্যতামূলক কোন কাজ বান্দার দ্বারা সংঘটিত হবে না এবং জগতসংসারেও কোন অশান্তি ঘটবে না। যেমনভাবে কোন মুসলিম শিশু জন্মগ্রহণের সাথে সাথে তার কানে আযান শোনানো হয়।[24] অথচ ঐ শিশু আযানের মর্ম বুঝে না বা বড় হয়েও তার সেকথা মনে থাকে না। অথচ ঐ আযানের মাধ্যমে তার হৃদয়ে প্রোথিত হয়ে যায় তাওহীদ, রিসালাত ও ইবাদতের বীজ। যার প্রভাব সে আজীবন অনুভব করে। সে বে-আমল হ’লেও ‘ইসলাম’-এর গন্ডী থেকে খারিজ হয়ে যেতে তার অন্তর কখনোই সায় দেয় না। তার অবচেতন মনে আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি আনুগত্য বোধ অক্ষুণ্ণ থাকে। বিশেষ করে হতাশা ও বিপন্ন অবস্থায় সে তার প্রভুর সাহায্য ও সান্নিধ্য লাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

অর্থ না বুঝলেও কুরআন পাঠ ও আযানের ধ্বনি মানুষের মনকে যেভাবে আকৃষ্ট করে এবং হৃদয়ে যে স্থায়ী

প্রভাব ফেলে তার কোন তুলনা নেই। একারণেই কাফির আরব নেতারা মানুষকে কুরআন শুনতে দিত না। অথচ নিজেরা রাতের অন্ধকারে তা গোপনে আড়ি পেতে শুনত এবং একে জাদু বলত। শ্রেষ্ঠ আরব কবিগণ কুরআনের অলৌকিকত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করেন এমনকি অন্যতম শ্রেষ্ঠ আরবী কবি লাবীদ বিন রাবী‘আহ কুরআন শোনার পর কাব্যচর্চা পরিত্যাগ করেন। গত শতাব্দীর শুরুতে তুরস্কে ওছমানীয় খেলাফত উৎখাত করে কামাল পাশা ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠা করেন এবং মসজিদ সমূহে আরবী আযান বন্ধ করে তুর্কী ভাষায় আযান দেওয়ার নির্দেশ জারি করেন। কিন্তু তাতে আরবী আযানের প্রতি মানুষের হৃদয়াবেগ আরও বৃদ্ধি পায়। ফলে গণবিদ্রোহ দেখা দিলে তিনি উক্ত আদেশ বাতিল করতে বাধ্য হন।
আধুনিক বিজ্ঞানও প্রমাণ করে দিয়েছে যে, শব্দ মানব মনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। তাই আল্লাহ প্রেরিত আযানের ধ্বনি সদ্যপ্রসূত শিশুর কচি মনে আজীবনের জন্য সুদূরপ্রসারী স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করবে- এটাই স্বাভাবিক। অতএব সৃষ্টির সূচনাকালের গৃহীত ‘আহেদে আলাস্ত্ত’ বা আল্লাহর প্রতি ইবাদত ও আনুগত্যের প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতি মানব মনে জীবনব্যাপী স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করে থাকে। যার কথা বারবার বান্দাকে স্মরণ করিয়ে দিতে হয় এবং যার বিরোধিতা করা আত্মপ্রবঞ্চনা করার শামিল।

‘আহেদে আলাস্ত্ত-র উদ্দেশ্য :

আল্লাহ বলেন,

أَنْ تَقُولُوْا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ، أَوْ تَقُولُوْا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ- (الأعراف -(১৭২ -১৭৪

‘(আমি পৃথিবীতে আবাদ করার আগেভাগে তোমাদের অঙ্গীকার এজন্যেই নিয়েছি) যাতে তোমরা ক্বিয়ামতের দিন একথা বলতে না পার যে, (তাওহীদ ও ইবাদতের) এ বিষয়টি আমাদের জানা ছিল না’। ‘অথবা একথা বলতে না পার যে, শিরকের প্রথা তো আমাদের পূর্বে আমাদের বাপ-দাদারা চালু করেছিল। আমরা হ’লাম তাদের পরবর্তী বংশধর। তাহ’লে সেই বাতিলপন্থীরা যে কাজ করেছে, তার জন্য কি আপনি আমাদের ধ্বংস করবেন’? আল্লাহ বলেন, ‘বস্ত্ততঃ এভাবে আমরা (আদিকালে ঘটিত) বিষয়সমূহ সবিস্তারে বর্ণনা করলাম, যাতে তারা (অর্থাৎ অবিশ্বাসীরা আমার পথে) ফিরে আসে’ (আ‘রাফ ১৭২-১৭৪)।
উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে বুঝা যায় যে, উক্ত প্রতিজ্ঞা ছিল দু’ধরনের। এক- আদিকালে ঘটিত প্রতিজ্ঞা (الميثاق الأزلى) এবং দুই- অহীর বিধানের আনুগত্য করার জাগতিক প্রতিজ্ঞা (والميثاق الإنزالي الحالي) যা প্রত্যেক নবীর আমলে তার উম্মতগণের উপরে ছিল অপরিহার্য।

অন্যান্য অঙ্গীকার গ্রহণ :

(১) নবী-রাসূলদের প্রতিশ্রুতি :

‘আহেদে আলাস্ত্তর মাধ্যমে সাধারণভাবে সকল আদম সন্তানের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি গ্রহণের পর আল্লাহ নবী-রাসূলদের কাছ থেকে বিশেষভাবে প্রতিশ্রুতি নেন; তারা যেন আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্তব্য রেসালাতের বাণীসমূহ স্ব স্ব উম্মতের নিকটে যথাযথভাবে পৌঁছে দেন এবং এতে কারো ভয়-ভীতি ও অপবাদ-ভৎর্সনার পরোয়া না করেন।

(২) উম্মতগণের প্রতিশ্রুতি :

অনুরূপভাবে বিভিন্ন নবীর উম্মতগণের কাছ থেকেও প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়, তারা যেন নিজ নিজ নবী-রাসূলদের আনুগত্য করে ও কোন অবস্থায় তাদের নাফরমানী না করে।

যেমন ছাহাবী উবাই ইবনু কা‘ব (রাঃ) সূরা আ‘রাফ ১৭২ আয়াত (অনুবাদঃ ‘যখন তোমার প্রভু বনু আদমের পিঠ সমূহ থেকে তাদের সন্তানদের বের করে আনলেন’)-এর ব্যাখ্যায় বলেন, অতঃপর আল্লাহ তাদের একত্রিত করলেন এবং নারী-পুরুষে বিভক্ত করলেন। অতঃপর তাদেরকে ভবিষ্যতের আকৃতি দান করলেন ও কথা বলার ক্ষমতা দিলেন। তখন তারা কথা বলল। অতঃপর আল্লাহ তাদের কাছ থেকে প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করলেন এবং তাদেরকে নিজেদের উপরে সাক্ষী করে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? তারা বলল, হ্যাঁ। আল্লাহ বললেন, আমি তোমাদের একথার উপর সাত আসমান ও সাত যমীনকে সাক্ষী করছি এবং তোমাদের উপর তোমাদের পিতা আদমকে সাক্ষী রাখছি, যাতে তোমরা ক্বিয়ামতের দিন একথা বলতে না পার যে, এ প্রতিশ্রুতির কথা আমরা জানতাম না।

তোমরা জেনে রাখ যে, আমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই ও আমি ব্যতীত কোন প্রতিপালক নেই। আর তোমরা আমার সাথে কাউকে শরীক করো না। সত্বর আমি তোমাদের নিকট আমার রাসূলগণকে পাঠাব। তাঁরা তোমাদেরকে আমার সাথে কৃত এই প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। আর আমি তোমাদের প্রতি আমার কিতাব সমূহ নাযিল করব। তখন তারা বলল, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই আপনি আমাদের প্রভু এবং উপাস্য। আপনি ব্যতীত আমাদের কোন প্রতিপালক নেই এবং আপনি ব্যতীত আমাদের কোন উপাস্য নেই। এভাবে তারা স্বীকৃতি দিল। অতঃপর আদমকে তাদের উপর উঠিয়ে ধরা হ’ল। তিনি তাদের দিকে দেখতে লাগলেন। তিনি দেখলেন তাদের মধ্যকার ধনী-গরীব, সুন্দর-অসুন্দর সবাইকে। তখন তিনি বললেন, হে প্রভু! আপনি কেন আপনার বান্দাদের সমান করলেন না? আল্লাহ বললেন, আমি চাই যে, এর ফলে আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হউক।

তিনি তাদের মধ্যে নবীগণকে দেখলেন প্রদীপ সদৃশ। তাঁদের নিকট থেকে পৃথকভাবে রিসালাত ও নবুঅতের দায়িত্ব পালনের বিশেষ অঙ্গীকার নেওয়া হয়। যে সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, ‘যখন আমরা নবীগণের নিকট থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করলাম এবং আপনার নিকট থেকেও এবং নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও মারিয়াম-পুত্র ঈসার নিকট থেকে’ (আহযাব ৩৩/৭)। ঐ রূহগুলির মধ্যে ঈসার রূহ ছিল, যা মারিয়ামের কাছে পাঠানো হয়। উবাই থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, উক্ত রূহ মারিয়ামের মুখ দিয়ে প্রবেশ করে’।[25]

(৪) শেষনবীর জন্য প্রতিশ্রুতি :

এরপর সকল নবীর কাছ থেকে বিশেষ প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়েছে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদাকে মেনে নেওয়ার জন্য, তাঁর অনুসরণের জন্য এবং তাঁর যুগ পেলে তাঁকে সাহায্য করার জন্য। যেমন-আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيْثَاقَ النَّبِيّيْنَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنْ كِتَابٍ وَّحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِيْ قَالُوْا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوْا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِيْنَ- (آل عمران ৮১)-

‘আর আল্লাহ যখন নবীগণের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলেন যে, আমি যা কিছু তোমাদেরকে দান করেছি কিতাব

ও হিকমত, অতঃপর তোমাদের নিকটে (যখন) রাসূল (শেষনবী) আসেন তোমাদের নিকট যা আছে (তাওরাত-ইঞ্জীল) তার সত্যয়নকারী হিসাবে, তখন সেই রাসূলের (শেষনবীর) প্রতি তোমরা ঈমান আনবে ও তাকে সাহায্য করবে। তিনি বললেন, তোমরা কি অঙ্গীকার করছ? এবং উপরোক্ত শর্তে তোমরা আমার ওয়াদা কবুল করে নিচ্ছ? তারা (নবীগণ) বলল, আমরা অঙ্গীকার করছি। তিনি (আল্লাহ) বললেন, তাহ'লে তোমরা সাক্ষী থাক। আর আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী রইলাম' (আলে ইমরান ৩/৮১)।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ...، 'স্মরণ কর, যখন মারিয়াম-তনয় ঈসা বলল, হে ইস্রাঈল সন্তানগণ! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রেরিত রাসূল এবং আমার পূর্ববর্তী তাওরাত কিতাবের সত্যয়নকারী। আর আমি একজন রাসূলের সুসংবাদ দানকারী, যিনি আমার পরে আসবেন, যার নাম হবে 'আহমাদ'... (ছফ ৬১/৬)।

উপরোক্ত আয়াত দ্বয়ে বুঝা যায় যে, বিগত সকল নবী যেমন তাঁর পূর্ববর্তী নবীর সত্যয়নকারী ছিলেন, তেমনি সকল নবী স্ব স্ব উম্মতের নিকটে শেষনবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আগমনবার্তা শুনিয়ে গেছেন ও তাঁর প্রতি ঈমান, আনুগত্য ও তাঁকে সার্বিকভাবে সাহায্য করার জন্য অছিয়ত করে গেছেন। এদিক দিয়ে শেষনবী যে বিশ্বনবী ছিলেন এবং তাঁর আনীত শরী'আতের মধ্যে বিগত সকল শরী'আত যে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে, তা পরিষ্কার হয়ে যায়।

(৫) ইহুদী পন্ডিতদের প্রতিশ্রুতি :

উপরোক্ত ওয়াদা ছাড়াও ইহুদী-নাছারা পন্ডিতদের কাছ থেকে বিশেষ প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়, যাতে তারা সত্য গোপন না করে। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ أَخَذَ اللّهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ أُوتُوْا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوْهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَناً قَلِيْلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُوْنَ- (آل عمران ١٨٧)-

'আর আল্লাহ যখন আহলে কিতাবদের (পন্ডিতদের) নিকট থেকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলেন যে, তারা তা লোকদের নিকটে বর্ণনা করবে ও তা গোপন করবে না। তখন তারা সে প্রতিজ্ঞাকে পিছনে রেখে দিল, আর তা বেচা-কেনা করল সামান্য পয়সার বিনিময়ে। কতই না মন্দ তাদের এ বেচা-কেনা'(আলে ইমরান ৩/১৮৭)।

(৬) সাধারণ বনু ইস্রাঈলগণের প্রতিশ্রুতি :

অতঃপর বনু ইস্রাঈলের সাধারণ লোকদের কাছ থেকেও প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়। যেমন আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ لاَ تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنِ وَقُولُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيْمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُوْنَ- (البقرة ٨٣)-

'যখন আমরা বনু ইস্রাঈলগণের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিলাম এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারু ইবাদত করবে না। আর তোমরা পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন ও ইয়াতীম-মিসকীনদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে এবং মানুষের সাথে সুন্দর কথা বলবে, ছালাত কায়েম করবে ও যাকাত আদায় করবে। কিন্তু কিছু লোক ব্যতীত তোমরা সবাই মুখ ফিরিয়ে নিলে এবং তোমরা তা অগ্রাহ্য করলে' (বাক্বারাহ ২/৮৩)।

বলা বাহুল্য যে, অধিকাংশ নবী বনু ইস্রাঈল থেকেই হয়েছেন। কিন্তু বনু ইস্রাঈলরাই অধিকাংশ নবীকে হত্যা

করেছে, তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, তাদের ঐশী কিতাবসমূহকে পরিবর্তন ও বিকৃত করেছে, তাদের নবীদের চরিত্র হনন করেছে, তাদের নামে কলংক লেপন করেছে এবং অবশেষে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে চিনতে পেরেও (বাক্বারাহ ২/১৪৬; আন'আম ৬/২০) না চেনার ভান করেছে ও তাঁর সঙ্গে চূড়ান্ত গাদ্দারী করেছে। অবশ্য তাদের মধ্যে অনেকে (قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا) ঈমান এনে ধন্য হয়েছিলেন এবং আল্লাহর নিকটে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছিলেন।[26]যেমন খ্যাতনামা ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম, আদী ইবনে হাতেম প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। এতদ্ব্যতীত হাবশার খৃষ্টান বাদশাহ নাজ্জাশী নিজে তো শেষনবীর উপরে বিশ্বাসী ছিলেন। অধিকন্তু তিনি আবিসিনিয়ার ৬২ জন ও সিরিয়ার ৮ জন মোট ৭০ জনের একটি শীর্ষস্থানীয় খৃষ্টান ধর্মীয় প্রতিনিধিদলকে মদীনায় প্রেরণ করেন। তাঁরা রাসূলের মুখে সূরা ইয়াসীন শুনে অবিরল ধারায় অশ্রু বিসর্জন দেন। অতঃপর সবাই ইসলাম গ্রহণ করেন'। তাদের প্রত্যাবর্তনের পর নাজ্জাশী নিজের ইসলাম কবুলের কথা ঘোষণা করেন এবং একখানা পত্র লিখে স্বীয় পুত্রের নেতৃত্বে আরেকটি প্রতিনিধিদল মদীনায় প্রেরণ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে জাহায ডুবির কারণে তারা সবাই পথিমধ্যে মৃত্যুবরণ করেন।[27]

আদমের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব :

'আশরাফুল মাখলূক্বাত' বা সেরা সৃষ্টি হিসাবে আল্লাহ আদম ও বনু আদমকে সৃষ্টি করেন। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْ آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلاً- (الإسراء ٧٠)-

'আমরা বনু আদমকে উচ্চ সম্মানিত করেছি, তাদেরকে স্থল ও জলপথে বহন করে নিয়েছি, তাদেরকে পবিত্র বস্ত্ত সমূহ হ'তে খাদ্য দান করেছি এবং আমাদের বহু সৃষ্টির উপরে তাদেরকে উচ্চ মর্যাদা প্রদান করেছি' (ইসরা ১৭/৭০)।

এখানে প্রথমে كَرَّمْنَا শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষকে এমন কিছু বিষয়ে একচ্ছত্র সম্মান দানের কথা বলা হয়েছে, যা অন্য কোন সৃষ্টিকে দেওয়া হয়নি। যেমন জ্ঞান-বিবেক, চিন্তাশক্তি, ভাল-মন্দ ও ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্যবোধ, স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের ক্ষমতা ইত্যাদি। অতঃপর فَضَّلْنَا শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে অন্যের তুলনায় মানুষকে উচ্চ মর্যাদা দানের কথা বলা হয়েছে। যেমন মানুষের উন্নত হ'তে উন্নততর জীবন যাপন প্রণালী, গৃহ নির্মাণ পদ্ধতি, খাদ্য গ্রহণ, পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদিতে উন্নততর রুচিশীলতা, আইনানুগ ও সমাজবদ্ধ জীবনযাপন প্রভৃতি বিষয়গুলি অন্যান্য প্রাণী হ'তে বৈশিষ্ট্য মন্ডিত এবং নানা বৈচিত্র্যে ভরপুর। তাতে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন, পরিবর্ধন, বিবর্তন ও উন্নয়ন অব্যাহত রয়েছে। অথচ বাবুই পাখির নীড় রচনা কিংবা বনে-জঙ্গলে বাঘ-শৃগালের বসবাস পদ্ধতি লক্ষ বছর ধরে অপরিবর্তিত রয়েছে। না তাতে অতীতে কোন পরিবর্তন এসেছে, না ভবিষ্যতে কোন পরিবর্তন আসার সম্ভাবনা রয়েছে।

মানুষ জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে উন্নত হ'তে উন্নততর পরিবহনে চলাফেরা ও ব্যবসা-বাণিজ্য করছে। তারা পৃথিবীর সর্বোত্তম খাদ্যসমূহ গ্রহণ করছে, উন্নত পাক-প্রণালীর মাধ্যমে সুস্বাদু খাবার গ্রহণ ও সর্বোত্তম পানীয় পান করছে, যা অন্য প্রাণীর পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়।

মানব মর্যাদার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিষয় হচ্ছে তাকে কথা বলার শক্তি দান করা, যা অন্য কোন সৃষ্টিকে দেওয়া হয়নি। তাকে দেওয়া হয়েছে ভাষা ও রঙের বৈচিত্র্য, দেওয়া হয়েছে লিখনক্ষমতা এবং উন্নত সাহিত্য জ্ঞান ও

অলংকার সমৃদ্ধ বাক্য গঠন ও কাব্য রচনার যোগ্যতা, যা অন্য কোন সৃষ্টিকে দেওয়া হয়নি।

মানব মর্যাদার অন্যতম বিষয় হ'ল, বিশ্বের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল সৃষ্টিকে মানুষের অনুগত করে দেওয়া হয়েছে (লোকমান ৩১/২০)। যেন আল্লাহর যাবতীয় সৃষ্টিকর্মের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মানুষ। মানুষের জন্যই যেন সবকিছু। সূর্যের কিরণ, চন্দ্রের জ্যোতি, গ্রহ-নক্ষত্রের মিটিমিটি আলো, বাতাসের মৃদুমন্দ প্রবাহ, পানির জীবনদায়িনী ক্ষমতা, মাটির উর্বরা শক্তি, আগুনের দাহিকা শক্তি, বিদ্যুতের বহু মাত্রিক কল্যাণকারিতা, মাঠভরা সবুজ শস্যভান্ডার, গাছ ভরা ফল-ফলাদি, বাগিচায় রং-বেরংয়ের ফুলের বাহার, পুকুর-নদী-সাগর ভরা নানা জাতের মাছ ও মণি-মুক্তার সমাহার, ভূগর্ভে সঞ্চিত স্বর্ণ-রৌপ্য ও খনিজ সম্পদরাজি ও তৈল-গ্যাসের আকর, গোয়াল ও জঙ্গলভরা পশু-পক্ষীর আবাস কাদের জন্য? এক কথায় জবাব: এসবই কেবল মানুষের জন্য। আল্লাহ বলেন, هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً 'তিনিই সেই সত্তা, যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীর সবকিছুকে সৃষ্টি করেছেন' (বাক্বারাহ ২/২৯)।

প্রশ্ন হ'ল: সবই যখন মানুষের জন্য, তাহ'লে মানুষ কার জন্য? তারও জবাব একটাই: 'আমরা আল্লাহর জন্য, এবং আমরা তাঁর কাছেই ফিরে যাব' (বাক্বারাহ ২/১৫৬)। 'আমরা এসেছি তাঁর ইবাদতের জন্য, সর্বক্ষেত্রে তাঁর দাসত্বের জন্য (যারিয়াত ৫১/৫৬) এবং দুনিয়ায় তাঁর খেলাফত পরিচালনার জন্য' (বাক্বারাহ ২/৩০)।।

বিশ্বলোকে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর ইবাদতে রত। সবই একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য (লোকমান ৩১/২৯) নির্দিষ্ট নিয়মের অধীনে পরিচালিত (ফাতির ৩৫/৪৩)। সবই আল্লাহর অনুগত ও তাঁর প্রতি সিজদায় অবনত এবং কেবল তাঁরই গুণগানে রত। জগত সংসার পরিচালনার এই সুনির্দিষ্ট নিয়মটাই হ'ল 'দ্বীন' এবং এই দ্বীনের প্রতি নিখাদ আনুগত্য ও আত্মসমর্পণকেই বলা হয় 'ইসলাম'। এজন্যেই বলা হয়েছে إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ 'আল্লাহর নিকটে 'দ্বীন' হ'ল কেবল 'ইসলাম' (আলে ইমরান ৩/১৯)।

ইসলামের দু'টি দিক রয়েছে, প্রাকৃতিক ও মানবিক। প্রথমটি সমস্ত বিশ্ব প্রকৃতিতে পরিব্যপ্ত। যেখানে সবকিছু সরাসরি আল্লাহ কর্তৃক প্রাকৃতিক নিয়মে পরিচালিত। যে নিয়মের কোন ব্যত্যয় নেই কোন ব্যতিক্রম নেই (আল্লাহর বিশেষ হুকুম ব্যতীত) (ইউসুফ ১২/৪০; আহযাব ৩৩/৬২; ইসরা ১৭/৭৭)।

দ্বিতীয়টি অর্থাৎ মানবিক জীবন পরিচালনার ব্যবহারিক নীতি-নিয়ম যা আল্লাহ যুগে যুগে নবী-রাসূলদের মাধ্যমে পাঠিয়েছেন। একেই বলে ইসলামী শরী'আত। যা আদম আলাইহিস সালামেরমাধ্যমে শুরু হয়ে শেষনবী মুহাম্মাদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে শেষ হয়েছে ও পূর্ণতা লাভ করেছে (মায়েদাহ ৫/৩)। উল্লেখ্য যে, আভিধানিক অর্থে বিগত সকল নবীর দ্বীনকে ইসলাম বলা গেলেও পারিভাষিকভাবে শেষনবীর নিকটে প্রেরিত সর্বশেষ ও পূর্ণাঙ্গ দ্বীনকেই কেবল 'ইসলাম' বলা হয়ে থাকে। আল্লাহ বলেন,

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ- (الروم ٣٠)-

'তুমি তোমার চেহারাকে দ্বীনের জন্য একনিষ্ঠ কর। এটিই আল্লাহর ফিৎরাত, যার উপরে তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই হ'ল সরল ধর্ম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না' (রূম ৩০/৩০)।

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা অপরিবর্তনীয় দ্বীনের প্রতি মানুষের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে বলেছেন, সেটি হ'ল সেই দ্বীন, যা বিশ্বলোকে প্রাকৃতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত। মানুষের দেহসত্তায় ও জীবন প্রবাহে উক্ত দ্বীন প্রতিবিম্বিত।

উক্ত দ্বীনের প্রতি আনুগত্যের কারণেই পিতার সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম শুক্রাণু থেকে মাতৃগর্ভে ভ্রুণ সৃষ্টি হয়। অতঃপর নির্ধারিত সময়ে তা সুন্দর ফুটফুটে মানবশিশু রূপে দুনিয়াতে ভূমিষ্ট হয়। অতঃপর শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও প্রৌঢ়ত্ব পেরিয়ে সে বার্ধক্যে উপনীত হয় ও এক সময় তার মৃত্যু হয়। দেহের এই জন্ম-মৃত্যুর নিয়মের কোন পরিবর্তন নেই। এক্ষেত্রে মানুষ সহ সকল সৃষ্টজীব ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় আল্লাহর অলংঘনীয় বিধানের প্রতি আনুগত্যশীল ও আত্মসমর্পিত 'মুসলিম' (আলে ইমরান ৩/৮৩; রা'দ ১৩/১৫)। এটা হ'ল 'ইসলাম'-এর প্রাকৃতিক দিক, যা মানতে প্রত্যেক মানুষ বাধ্য। মানুষের দেহ তাই প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন। কিন্তু জ্ঞানের দিক দিয়ে সে স্বাধীন। সে তার জ্ঞানকে স্বাধীনভাবে প্রয়োগ করতে পারে।

মানুষের বাহ্যিক আকৃতির শ্রেষ্ঠত্বের সাথে তার আধ্যাত্মিক দিকের সংযোগ এক অসাধারণ ব্যাপার। অথচ বিশ্বলোকের অন্যান্য সৃষ্টির বাইরের দিক ও ভিতরের দিকের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। চন্দ্র-সূর্যের সবটাই আলো, পশুর সবটাই পশুত্বে ভরা। কিন্তু মানুষের বাইরের দিকের সাথে ভিতরের দিকের কোন মিল নেই। বরং তা আরও জটিল ও দুর্বোধ্য। মানুষের দৈহিক অবয়বের মধ্যে ওটা একটা আলাদা জগত। যা দেখা যায় না, কেবল উপলব্ধি করা যায়। মানুষ যেমন ষড় রিপু সমৃদ্ধ একটি জৈবিক সত্তা, তেমনি সে একটি বিবেকবান নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সত্তা। মানুষের দেহ জগতের চিকিৎসা ও আরাম-আয়েশের উপকরণ তাই কমবেশী সর্বত্র প্রায় সমান হ'লেও তার মনোজগতের চিকিৎসা ও সুখ-দুঃখের অনুভূতি সবার জন্য সমান নয়। মনোজগতে শয়তানের তাবেদার হয়ে সে অনেক সময় তার বাহ্যিক দেহ জগতকে ধ্বংস করে দেয়। মূলত: মনোজগতে লালিত ধারণা ও বিশ্বাসই মানুষের কর্মজগতে প্রতিফলিত হয়। তাই দয়ালু আল্লাহ তাঁর প্রিয় সৃষ্টি মানুষের সার্বিক জীবন সঠিক পথে পরিচালনার জন্য যুগে যুগে নবীগণের মাধ্যমে এলাহী হেদায়াত সমূহ পাঠিয়েছেন। প্রাকৃতিক দ্বীন-এর মত এই দ্বীনও অপরিবর্তনীয় ও চিরকল্যাণময়। আর সেটাই হ'ল ইসলামের বাহ্যিক মানবিক দিক। উক্ত মানবিক দিক পরিচালনার উদ্দেশ্যে যে দ্বীন নবীদের মাধ্যমে প্রেরিত হয়েছে, তা গ্রহণ ও পালনের স্বাধীন এখতিয়ার মানুষকে দেওয়া হয়েছে (কাহফ ১৮/২৯; দাহর ৭৬/৪)।

এ দ্বীন বা শরী'আতের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণে মানুষ দুনিয়ায় শান্তি পাবে ও আখেরাতে জান্নাত লাভে ধন্য হবে। আর তা অমান্য করলে দুনিয়ায় অশান্তি ভোগ করবে ও পরকালে জাহান্নামের আগুনে দগ্ধীভূত হবে (বাক্বারাহ ২/৩৮-৩৯; তাগাবুন ৬৪/ ৯-১০)।

বলা বাহুল্য, এ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিই মানুষের 'সৃষ্টির সেরা' হওয়ার মূল কারণ। এতেই তার পরীক্ষা এবং এতেই তার জান্নাত বা জাহান্নাম। মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের সবচেয়ে বড় দিক হ'ল এ পৃথিবীতে আল্লাহর খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা। কেননা তাকে 'আল্লাহর খলীফা' হিসাবেই দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছে।[28] এ দুনিয়াকে আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী সুন্দরভাবে আবাদ করা এবং অহীর বিধান অনুযায়ী সার্বিক জীবন পরিচালনার মাধ্যমে আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করাই তার প্রধান কাজ। খেলাফতের এ দায়িত্ব সে ব্যক্তি জীবনে যেমন পালন করবে, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনেও তেমনি পালন করবে। সর্বত্র সে আল্লাহর বিধানের প্রতি আনুগত্যশীল বান্দা হিসাবে নিজেকে প্রমাণ করবে। এই গুরু দায়িত্ব আসমান-যমীন, পাহাড়-পর্বত কেউ গ্রহণ করতে সাহসী হয়নি। মানুষ স্বেচ্ছায় এ দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল (আহযাব ৩৩/৮২)। কিন্তু দুনিয়ায় এসে এর চাকচিক্য দেখে মানুষ মোহগ্রস্ত হয়ে গেছে ও আল্লাহর খেলাফতের দায়িত্ব পালনের কথা ভুলে গেছে। কেউবা তাতে অলসতা দেখাচ্ছে, কেউবা অস্বীকার করছে। তবুও ক্বিয়ামত-প্রাক্কাল অবধি একদল লোক চিরদিন থাকবে,

যারা এ দায়িত্ব পালন করে যাবে।[29] আল্লাহ বলেন, وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ–

'আমরা যাদের সৃষ্টি করেছি তাদের মধ্যে একটি দল রয়েছে, যারা সত্য পথ দেখায় ও সেমতে ন্যায়বিচার করে' (আ'রাফ ৭/১৮১)। অতঃপর তিনি বলেন, سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ'হে জিন ও ইনসান! অতিসত্বর আমরা তোমাদের ব্যাপারে মনোনিবেশ করব' (রহমান ৫৫/৩১)। অর্থাৎ একটি বিশেষ মুহূর্তে দুনিয়াতে তোমাদের পরীক্ষা গ্রহণের এই ধারা সহসাই বন্ধ হয়ে যাবে এবং তোমাদেরকে পুনর্জীবিত করে হাশরের ময়দানে একত্রিত করা হবে। সেদিন আমার সুক্ষ্ম বিচারের হাত থেকে তোমরা কেউই রেহাই পাবে না। জিনদের আল্লাহ আগেই সৃষ্টি করেন আগুন থেকে। তারাও ছিল স্বাধীন এখতিয়ার সম্পন্ন। কিন্তু তারা অবাধ্যতা করেছিল। অনেকে জিনকে চর্ম চক্ষুতে দেখতে পায় না বলে তাদেরকে অস্বীকার করে। অথচ বহু জিনিষ রয়েছে যা মানুষ বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখতে পায় না। তাই বলে তাদের অস্তিত্বকে অস্বীকার করা যায় না। যেমন বিদ্যুৎ, বায়ু প্রবাহ, বস্তুর স্বাদ ও গন্ধ ইত্যাদি। মানুষের নবীই জিনদের নবী। তাদের মধ্যে মুমিন, কাফির, ফাসিক সবই রয়েছে। জিনেরা যে এলাকায় বাস করে সে এলাকার মানুষের ভাষা তারা বুঝে। নবুঅতের দশম বছরে ত্বায়েফ থেকে ফেরার পথে 'নাখলা' উপত্যকায় জিনেরা রাসূলের কণ্ঠে সূরা রহমান শুনেছিল ও যতবারই আল্লাহ فَبِأَيِّ آلاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ বলেছেন, ততবারই তারা জবাবে বলেছিল, লা বেশাইয়িন মিন নি'আমিকা রববানা নুকাযযিবু ফালাকাল হাম্দ।[30] তারা মানুষের কথা শোনে, বুঝে ও উপলব্ধি করে। আল্লাহর কিতাব জিন ও ইনসান সবার জন্য। অতএব তাদের পরিণতি ও মানুষের পরিণতি একই।

বস্ততঃ আদম ও বনু আদম হ'ল আল্লাহর সর্বাধিক প্রিয় ও সেরা সৃষ্টি। মৃত্যুকাল অবধি তাকে এ দুনিয়ার পরীক্ষাগারে অবস্থান করতে হবে একজন সজাগ ও সক্রিয় পরীক্ষার্থী হিসাবে। মৃত্যুর পরেই তার ক্বিয়ামত শুরু হয়ে যাবে। ভাল-মন্দ কর্মের সুযোগ আর থাকবে না। তাই আল্লাহ প্রেরিত অহীর বিধান মেনে চলে কল্যাণময় জীবন পরিচালনার মাধ্যমে আল্লাহর সেরা সৃষ্টির মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে দুনিয়া থেকে বিদায় হওয়াই বুদ্ধিমান মানুষের কর্তব্য।

মনে রাখতে হবে যে, 'আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তাঁর দিকেই ফিরে যাব'(বাক্বারাহ ২/১৫৬)। 'আমাদের ছালাত, আমাদের কুরবানী, আমাদের জীবন, আমাদের মরণ সবকিছুই কেবলমাত্র বিশ্বপ্রভু আল্লাহর জন্য' (আন'আম ৬/১৬৩)। জান্নাত থেকে নিক্ষিপ্ত বনু আদম আমরা যেন পুনরায় জান্নাতে ফিরে যেতে পারি, করুণাময় আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক দান করুন- আমীন!!

দুনিয়াবী ব্যবস্থাপনায় আদম (আঃ) :

হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী (রহঃ) الطب النبوى কেতাবে বলেন, মানুষের দুনিয়াবী জীবনে প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার শিল্পকর্ম অহীর মাধ্যমে কোন না কোন নবীর হাতে শুরু হয়েছে। অতঃপর যুগে যুগে তার উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। সর্বপ্রথম আদম (আঃ)-এর উপরে যে সব অহী নাযিল করা হয়েছিল, তার অধিকাংশ ছিল ভূমি আবাদ করা, কৃষিকার্য ও শিল্প সংক্রান্ত। যাতায়াত ও পরিবহনের জন্য চাকা চালিত গাড়ী সর্বপ্রথম আদম (আঃ) আবিষ্কার করেন। কালের বিবর্তনে নানাবিধ মডেলের গাড়ী এখন চালু হয়েছে। কিন্তু সব গাড়ীর ভিত্তি হ'ল চাকার উপরে। বলা চলে যে, সভ্যতা এগিয়ে চলেছে চাকার উপরে ভিত্তি করে। অতএব যিনি প্রথম এটা চালু করেন, তিনিই বড় আবিষ্কারক। আর তিনি ছিলেন আমাদের আদি পিতা প্রথম মানুষ ও প্রথম

নবী হযরত আদম(আলাইহিস সালাম)। যা তিনি অহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়েছিলেন।[31] আদমের যুগে পৃথিবীর প্রথম কৃষিপণ্য ছিল ‘তীন’ ফল। ফিলিস্তীন ভূখন্ড থেকে সম্প্রতি প্রাপ্ত সে যুগের একটি আস্ত তীন ফলের শুষ্ক ফসিল পরীক্ষা করে একথা প্রমাণিত হয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ ‘তীন’ ফলের শপথ করেছেন। আল্লাহ আমাদের আদি পিতার উপরে শান্তি বর্ষণ করুন- আমীন!

আদম পুত্রদ্বয়ের কাহিনী :

আল্লাহ বলেন, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. ‘আপনি ওদেরকে (আহলে কিতাবদেরকে) আদম পুত্রদ্বয়ের যথার্থ কাহিনী শুনিয়ে দিন। যখন তারা উভয়ে কুরবানী পেশ করল। অতঃপর তাদের একজনের কুরবানী কবুল হ’ল। কিন্তু অপরজনের কুরবানী কবুল হ’ল না। তখন একজন বলল, আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করব। জবাবে অপরজন বলল, আল্লাহ কেবলমাত্র আল্লাহভীরুদের থেকেই কবুল করেন’ (মায়েদাহ ২৭)। ‘যদি তুমি আমাকে হত্যার উদ্দেশ্যে হাত বাড়াও, আমি তোমাকে হত্যার উদ্দেশ্যে হাত বাড়াবো না। আমি বিশ্বপ্রভু আল্লাহকে ভয় করি’ (২৮)। ‘আমি মনে করি এর ফলে তুমি আমাকে হত্যার পাপ ও তোমার অন্যান্য পাপসমূহের বোঝা নিয়ে জাহান্নামবাসী হবে। আর সেটাই হ’ল অত্যাচারীদের কর্মফল’ (২৯)। ‘অতঃপর তার মন তাকে ভ্রাতৃহত্যায় প্ররোচিত করল এবং সে তাকে হত্যা করল। ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হ’ল’ (৩০)। ‘অতঃপর আল্লাহ একটি কাক পাঠালেন। যে মাটি খনন করতে লাগল এটা দেখানোর জন্য যে কিভাবে সে তার ভাইয়ের মৃতদেহ দাফন করবে। সে বলল, হায়! আমি কি এই কাকটির মতোও হ’তে পারলাম না, যাতে আমি আমার ভাইয়ের মৃতদেহ দাফন করতে পারি। অতঃপর সে অনুতপ্ত হ’ল’(মায়েদাহ ৫/২৭-৩১)।

কুরআনের উক্ত বর্ণনা ছাড়াও ‘জাইয়িদ’ (উত্তম) সনদ সহ আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ও আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস (রাঃ) থেকে ‘মওকূফ’ সূত্রে যা যা বর্ণিত হয়েছে এবং হাফেয ইবনু কাছীর যাকে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী একাধিক বিদ্বানগণের ‘মশহূর’ বক্তব্য বলে স্বীয় তাফসীরে ও তারীখে উল্লেখ করেছেন, সে অনুযায়ী আদম পুত্রদ্বয়ের নাম ছিল ক্বাবীল ও হাবীল (قابيل وهابيل) এবং ক্বাবীল ছিল আদমের প্রথম সন্তান ও সবার বড় এবং হাবীল ছিল তার ছোট।

হত্যাকান্ডের কারণ :

এ বিষয়ে কুরআন যা বলেছে তা এই যে, দু’ভাই আল্লাহর নামে কুরবানী করেছিল। কিন্তু আল্লাহ একজনের কুরবানী কবুল করেন, অন্যজনেরটা করেননি। তাতে ক্ষেপে গিয়ে একজন অন্যজনকে হত্যা করে, যার কুরবানী কবুল হয়েছিল।

উল্লেখ্য যে, সে যুগে কুরবানী কবুল হওয়ার নিদর্শন ছিল এই যে, আসমান থেকে একটি আগুন এসে কুরবানী নিয়ে অন্তর্হিত হয়ে যেত। যে কুরবানীকে উক্ত অগ্নি গ্রহণ করত না, সে কুরবানীকে প্রত্যাখ্যাত মনে করা হ’ত। ক্বাবীল কৃষিকাজ করত। সে কার্পণ্য বশে কিছু নিকৃষ্ট প্রকারের শস্য, গম ইত্যাদি কুরবানীর জন্য পেশ করল। হাবীল পশু পালন করত। সে আল্লাহর মহববতে তার উৎকৃষ্ট দুম্বাটি কুরবানী করল। অতঃপর আসমান থেকে আগুন এসে হাবীলের কুরবানীটি নিয়ে গেল। কিন্তু কাবীলের কুরবানী যেমন ছিল, তেমনি পড়ে রইল। এতে ক্বাবীল ক্ষুব্ধ হ’ল এবং হাবীলকে বলল, لَأَقْتُلَنَّكَ ‘আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করব’। হাবীল তখন তাকে উপদেশ দিয়ে মার্জিত ভাষায় বলল, إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ

يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لَأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ- ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তাক্বওয়াশীল বান্দাদের থেকে (কুরবানী) কবুল করে থাকেন। এক্ষণে যদি তুমি আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হও, তবে আমি তোমাকে পাল্টা হত্যা করতে উদ্যত হব না। কেননা আমি বিশ্বচরাচরের পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করি’ (মায়েদাহ ৫/২৭-২৮)।

ইবনু আববাস (রাঃ) বলেন, হাবীলের কুরবানী দেওয়া দুম্বাটিই পরবর্তীতে ইবরাহীম (আঃ) কর্তৃক ইসমাঈলকে কুরবানীর বিনিময় হিসাবে জান্নাত থেকে পাঠানো হয়।[32]

আহলে কিতাব-এর মধ্যে যুগ যুগ ধরে প্রসিদ্ধি আছে যে, হত্যাকান্ডের স্থলটি ছিল উত্তর দামেষ্কে ‘ক্বাসিয়ূন’ (قاسيون) পাহাড়ের একটি গুহায়। যা আজও ‘রক্তগুহা’ (مغارة الدم) নামে খ্যাত। যদিও এর কোন নিশ্চিত ভিত্তি নেই।[33]

কুরতুবী বলেন, ক্বাবীল স্রেফ হিংসা বশে হাবীলকে হত্যা করেছিল। সে চায়নি যে, ছোট ভাই হাবীল তার চাইতে উত্তম ব্যক্তি হিসাবে সমাজে প্রশংসিত হৌক (তাফসীর কুরতুবী) ইবনু কাছীর বলেন, ইতিপূর্বে মায়েদাহ ২০ হ’তে ২৬ আয়াত পর্যন্ত ৭টি আয়াতে মূসার প্রতি বনু ইস্রাঈলের অবাধ্যতা এবং তার শাস্তি স্বরূপ তীহ প্রান্তরে তাদের দীর্ঘ ৪০ বছরের বন্দীত্ব বরণের লাঞ্ছনাকর ইতিহাস শুনানোর পর মদীনার ইহুদীদেরকে আদম পুত্রদ্বয়ের পারস্পরিক হিংসার মর্মান্তিক পরিণামের কথা শুনানো হয়েছে একারণে যে, তারা যেন স্রেফ হিংসা বশে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অবাধ্যতা না করে এবং কুরআনকে অস্বীকার না করে’ (তাফসীর ইবনু কাছীর)। কেননা তারা শেষনবীকে চিনলেও তাকে মানেনি স্রেফ এই হিংসার কারণে যে, ইস্রাঈল বংশে তাঁর জন্ম না হয়ে ইসমাঈল বংশে জন্ম হয়েছিল। এই জ্ঞাতি হিংসা ইহুদীদেরকে মুসলমানদের চিরশত্রুতে পরিণত করেছে। একইভাবে কেবল মাত্র হিংসার কারণেই কাবীল তার সহোদর ছোট ভাই হাবীলকে খুন করেছিল এবং পৃথিবীতে প্রথম হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়েছিল। কেবল ইহুদী-নাছারা নয়, যুগে যুগে ইসলাম-বিদ্বেষী সকলের অবস্থা প্রায় একইরূপ। আজকের বিশ্বের অশুভ শক্তি বলয় সর্বত্র ইসলামের ও ইসলামের নবীর বিরুদ্ধে যেভাবে বিষোদ্গার করে যাচ্ছে, তা কেবলি সত্যের বিরুদ্ধে মিথ্যার চিরন্তন হিংসার আধুনিক রূপ মাত্র।

উল্লেখ্য যে, আদম (আঃ)-এর শরী‘আতের বিরোধিতা করে নিজের যমজ সুশ্রী বোনকে জোর করে বিয়ে করার জন্য এবং উক্ত বিয়ের দাবীদার হাবীলকে পথের কাঁটা মনে করে তাকে চিরতরে সরিয়ে দেওয়ার জন্য কাবীল হাবীলকে হত্যা করে ছিল বলে যে ‘আছার’ সমূহ ইবনু জারীর, কুরতুবী, ইবনু কাছীর প্রভৃতি তাফসীরের কিতাবে বর্ণিত হয়েছে, তার সবগুলিই ‘মুরসাল’, যঈফ ও মওযূ। ইবনু কাছীর বলেন, এগুলি স্রেফ ইস্রাঈলী উপকথা মাত্র এবং পরবর্তীতে মুসলমান হওয়া সাবেক ইহুদী পন্ডিত কা‘ব আল-আহবার থেকে নকলকৃত।[34]

আইয়ূব সাখতিয়ানী বলেন, উম্মতে মুহাম্মাদীর মধ্যে এই আয়াতের উপর আমলকারী প্রথম ব্যক্তি হ’লেন তৃতীয় খলীফা হযরত ওছমান ইবনু আফফান (ইবনু কাছীর)। যিনি ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও এবং নিজের জীবনের বিনিময়ে হ’লেও বিদ্রোহীদের দমনে মদীনাবাসীকে অস্ত্রধারণের অনুমতি দেননি। ‘ফিৎনার সময় বসে থাকা ব্যক্তি দাঁড়ানো ব্যক্তির চেয়ে উত্তম’ রাসূল (ছাঃ)-এর এরূপ নির্দেশনা প্রসঙ্গে হযরত সা‘দ ইবনু আবী ওয়াক্কাছ (রাঃ) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! যখন আমাকে হত্যার জন্য আমার ঘরে ঢুকে কেউ আমার

দিকে হাত বাড়াবে, তখন আমি কি করব? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, كُنْ كَخَيْرِ ابْنَىْ آدَمَ‘তুমি আদমের দুই পুত্রের মধ্যে উত্তমটির মত হও’ (অর্থাৎ হাবীলের মত মৃত্যুকে বরণ কর)। অতঃপর আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) মায়েদাহ ২৮ আয়াতটি পাঠ করে শুনালেন’।[35]

ইবনু কাছীর বলেন যে, এই সব ‘আছার’ একথা দাবী করে যে, আদম পুত্রদ্বয়ের কুরবানী বিশেষ কোন কারণ বশে ছিল না বা কোন নারীঘটিত বিষয় এর মধ্যে জড়িত ছিল না। কুরআনের প্রকাশ্য অর্থ উক্ত কথা সমর্থন করে, যা মায়েদাহ ২৭ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। অতএব পূর্বাপর বিষয় সমূহ দ্বারা একথাই স্পষ্ট হয় যে, ভ্রাতৃ হত্যার কারণ ছিল স্রেফ এই হিংসা বশতঃ যে, হাবীলের কুরবানী কবুল হয়েছিল, কিন্তু ক্বাবীলের কুরবানী কবুল হয়নি (তাফসীর ইবনু কাছীর)। যদিও এতে হাবীলের কোন হাত ছিল না। ভালোর প্রতি এই হিংসা ও আক্রোশ মন্দ লোকদের মজ্জাগত স্বভাব। যা পৃথিবীতে সর্ব যুগে বিদ্যমান রয়েছে। এর ফলে ভালো লোকেরা সাময়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হ’লেও চূড়ান্ত বিচারে তারাই লাভবান হয়ে থাকেন। পক্ষান্তরে মন্দ লোকেরা সাময়িকভাবে লাভবান হ’লেও চূড়ান্ত বিচারে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। নির্দোষ হাবীলকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে ক্বাবীল তার আক্রোশ মিটিয়ে সাময়িকভাবে তৃপ্তিবোধ করলেও চূড়ান্ত বিচারে সে অনন্ত ক্ষতির মধ্যে পতিত হয়েছে। সেদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ বলেন, فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ-‘অতঃপর সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হ’ল’ (মায়েদাহ ৫/৩০)।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, لاَ تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ، رواه البخاري-‘অন্যায়ভাবে কোন মানুষ নিহত হ’লে তাকে খুন করার পাপের একটা অংশ আদমের প্রথম পুত্রের আমলনামায় যুক্ত হয়। কেননা সেই-ই প্রথম হত্যাকান্ডের সূচনা করে’।[36]তিনি আরও বলেন, ‘যে ব্যক্তির উপর তার ভাইয়ের সম্মানহানি বা অন্য কোন প্রকারের যুলুম রয়েছে, সে যেন তার থেকে আজই তা মুক্ত করে নেয়, সেইদিন আসার আগে, যেদিন তার নিকটে দীনার ও দিরহাম (স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা) কিছুই থাকবে না (অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্বে)। যদি তার নিকট কোন সৎকর্ম থাকে, তবে তার যুলুম পরিমাণ নেকী সেখান থেকে নিয়ে নেওয়া হবে। আর যদি তার কোন নেকী না থাকে, তাহ’লে মযলূমের পাপ সমূহ নিয়ে যালেমের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে’।[37]

উক্ত মর্মে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالاً مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ-‘আর তারা অবশ্যই নিজেদের পাপভার বহন করবে ও তার সাথে অন্যদের পাপভার এবং তারা যেসব মিথ্যারোপ করে, সে সম্পর্কে ক্বিয়ামতের দিন অবশ্যই জিজ্ঞাসিত হবে’ (আনকাবূত ২৯/১৩)।

শিক্ষণীয় বিষয় :

(১) ক্বাবীল ও হাবীলের উক্ত কাহিনীর মধ্যে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির তাড়নায় প্ররোচিত হওয়ার ও তার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন হওয়ার প্রমাণ নিহিত রয়েছে।

(২) অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা যে সর্বাপেক্ষা জঘন্য পাপ এবং তওবা ব্যতীত হত্যাকারীর কোন নেক আমল আল্লাহ কবুল করেন না, তার প্রমাণ রয়েছে।

(৩) আল্লাহভীরু ব্যক্তিগণ অন্যায়ের পাল্টা অন্যায় করেন না, বরং আল্লাহর উপরে ভরসা করেন ও তাঁর নিকটেই তার বদলা কামনা করেন।

(৪) অন্যায়ের ফলে অন্যায়কারী এক সময় অনুতপ্ত হয় ও দুনিয়াতে সে অন্তর্জ্বালায় দগ্ধীভূত হয় এবং আখেরাতে জাহান্নামের খোরাক হয়।

(৫) নেককার ব্যক্তিগণ দুনিয়ার দুঃখ-কষ্টকে আল্লাহর পরীক্ষা মনে করেন এবং এতে ধৈর্য ধারণ করেন।

(৬) মযলূম যদি ধৈর্য ধারণ করে, তবে তার গোনাহ সমূহ যালেমের ঘাড়ে চাপে এবং দুই জনের পাপের শাস্তি যালেমকে একাই ভোগ করতে হয়।

(৭) মানুষ মারা গেলে কবর দেওয়াই আল্লাহ প্রদত্ত চিরন্তন বিধান। ইসলামী শরী'আতে এই বিধান রয়েছে (আবাসা ৮০/২১)। অতএব মৃত মানুষকে পুড়িয়ে ভস্ম করা উক্ত আবহমান কালব্যাপী এলাহী সুন্নাতের স্পষ্ট লংঘন।

(৮) অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যার এই সিলসিলা ক্বাবীলের মাধ্যমে শুরু হয় বিধায় ক্বিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ অন্যায়ভাবে খুন হবে, সকল হত্যাকারীর পাপের বোঝা ক্বাবীলের আমলনামায় চাপানো হবে। অতএব অন্যায়ের সূচনাকারীগণ সাবধান!

মৃত্যু ও বয়স :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের দিনগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম দিন হ'ল জুম'আর দিন। এ দিনেই আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে, এ দিনেই তার মৃত্যু হয়েছে এবং এ দিনেই ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে...'।[38] আদম (আঃ)-কে এক হাযার বছর বয়স দেওয়া হয়েছিল। রূহের জগতে দাঊদ (আঃ)-এর সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তিনি নিজের বয়স থেকে ৪০ বছর তাকে দান করেন। ফলে অবশিষ্ট ৯৬০ বছর তিনি জীবিত ছিলেন।[39]

আদম (আঃ)-এর জীবনী থেকে শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ :

১. তিনি সরাসরি আল্লাহর দু'হাতে গড়া এবং মাটি হ'তে সৃষ্ট। তিনি জ্ঞানসম্পন্ন ও পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসাবে জীবন লাভ করেছিলেন।

২. তিনি ছিলেন মানব জাতির আদি পিতা ও প্রথম নবী।

৩. তিনি জিন জাতির পরবর্তী প্রতিনিধি হিসাবে এবং দুনিয়া পরিচালনার দায়িত্বশীল খলিফা হিসাবে প্রেরিত হয়েছিলেন।

৪. দুনিয়ার সকল সৃষ্ট বস্ত্তর নাম অর্থাৎ সেসবের জ্ঞান ও তা ব্যবহারের যোগ্যতা তাকে দান করা হয়েছিল।

৫. জিন ও ফিরিশতা সহ সকল প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সৃষ্টির উপরে মানব জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত। সকলে তাদের অনুগত ও তাদের সেবায় নিয়োজিত।

৬. আদমকে জান্নাতে সৃষ্টি করা হয়। যা পৃথিবীর বাইরে আসমানে সৃষ্ট অবস্থায় তখনও ছিল, এখনও আছে।

৭. জান্নাতে আদমের পাঁজরের হাড় থেকে তার জোড়া হিসাবে স্ত্রী হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়। সেকারণ স্ত্রী জাতি সর্বদা পুরুষ জাতির অনুগামী এবং উভয়ে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট।

৮. আদম ও হাওয়াকে আসমানী জান্নাত থেকে দুনিয়ায় নামিয়ে দেওয়া হয় এবং পৃথিবীর নাভিস্থল মক্কার সন্নিকটে না'মান উপত্যকায় অর্থাৎ আরাফাতের ময়দানে ক্বিয়ামত পর্যন্ত জন্মগ্রহণকারী সকল মানুষের ক্ষুদ্রদেহী অবয়ব সৃষ্টি করে তাদের নিকট থেকে 'আহদে আলাস্ত্ত' অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি দাসত্বের স্বীকৃতি ও প্রতিশ্রুতি নেওয়া হয়।

৯. মানুষ হ’ল পৃথিবীর একমাত্র জ্ঞান সম্পন্ন প্রাণী। তাকে ভাল ও মন্দ দু’টিই করার ইচ্ছাশক্তি ও স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে।

১০. আদমের মধ্যে মানবত্ব ও নবুওয়াতের নিষ্পাপত্ব উভয় গুণ ছিল। তিনি শয়তানের প্ররোচনায় আল্লাহর নিষেধাজ্ঞার কথা সাময়িকভাবে ভুলে গিয়ে নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল খেয়ে অনুতপ্ত হন ও তওবা করেন। তওবা কবুল হবার পরে তিনি নবুঅত প্রাপ্ত হন। অতএব নিঃসন্দেহে তিনি নিষ্পাপ ছিলেন। একইভাবে আদমের আওলাদগণ পাপ করে তওবা করলে আল্লাহ তা মাফ করে থাকেন।

১১. আদমকে সিজদা না করার পিছনে ইবলীসের অহংকার ও তার পরিণতিতে তার অভিশপ্ত হওয়ার ঘটনার মধ্যে মানুষকে অহংকারী না হওয়ার শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে।

১২. জৈবিক ও আধ্যাত্মিক দিকের সমন্বয়ে মানুষ একটি অসাধারণ সত্তা, যা অন্য কোন সৃষ্টির সাথে তুলনীয় নয়।

১৩. ঈমানদার বান্দাগণ ক্বিয়ামতের দিন বিচার শেষে পুনরায় জান্নাতে ফিরে যাবে।

১৪. দুনিয়াবী ব্যবস্থাপনার সকল জ্ঞান আদমকে দেওয়া হয়েছিল এবং তার মাধ্যমেই পৃথিবীতে প্রথম ভূমি আবাদ ও চাকা চালিত পরিবহনের সূচনা হয়।

১৫. সবকিছুই সৃষ্টি হয়েছে মানুষের সেবার জন্য। আর মানুষ সৃষ্টি হয়েছে আল্লাহর দাসত্বের জন্য।

---

[1]. মুমিনূন ২৩/১২; ছাফফাত ৩৭/১১; রহমান ৫৫/১৪; তীন ৯৫/৪ ইত্যাদি।

[2]. নিসা ৪/১; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩২৩৮ ‘বিবাহ’ অধ্যায় ‘নারীদের সাথে সদ্ব্যবহার’ অনুচ্ছেদ। আদম এর মূল উপাদান হ’ল মাটি, তাই তাকে ‘আদম’ বলা হয়। পক্ষান্তরে হাওয়ার মূল হ’লেন আদম, যিনি তখন জীবন্ত ব্যক্তি। তাই তাকে ‘হাওয়া’ বলা হয়, যা ‘হাই’ (জীবন্ত) থেকে উৎপন্ন (কুরতুবী), বাক্বারাহ ৩৫; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/৬২ পৃঃ।

[3]. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (বৈরুত:দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তাবি) ১/৬৭।

[4]. আহমাদ, ত্বাবারাণী, মিশকাত হা/৫৭৩৭ ‘ক্বিয়ামতের অবস্থা’ অধ্যায় ‘সৃষ্টির সূচনা ও নবীগণের আলোচনা’ অনুচ্ছেদ।

[5]. তিরমিযী, আহমাদ, আবুদাঊদ মিশকাত হা/২১২ ‘ইল্ম’ অধ্যায়।

[6]. আহমাদ, মিশকাত হা/৪২ ‘ঈমান’ অধ্যায়।

[7]. মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫১৬ ‘ফিতান’ অধ্যায়।

[8]. যথাক্রমে সূরা বাক্বারাহ ২/৩১-৩৭= ৭; আলে ইমরান ৩/৩৩,৫৯; মায়েদাহ ৫/২৭-৩২= ৬; আ‘রাফ ৭/১১, ১৯, ২৬, ২৭, ৩১, ৩৫, ১৭২-৭৩= ৮; হিজর ১৫/২৬-৪২= ১৭; ইসরা ১৭/৬১, ৭০; ইয়াসীন ৩৬/৬০। সর্বমোট = ৫০টি।

[9]. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/৬৫।

[10]. বুখারী হা/৪৭২৭ ‘তাফসীর’ অধ্যায়, সূরা কাহফ।

[11]. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬৮ ‘ঈমান’ অধ্যায় ‘ওয়াসওয়াসা’ অনুচ্ছেদ।

[12]. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/৬৬।

[13]. নিসা ৪/১; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩২৩৮ ‘বিবাহ’ অধ্যায় ১০ম অনুচ্ছেদ।

[14]. তাফসীর ইবনে জারীর (বৈরুত: ১৪০৬/১৯৮৬) ৮/১০৯ পৃঃ, সূরা আ‘রাফ ৭/ ২২।

[15]. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৩৩-৪৩৪ ‘পবিত্রতা’ অধ্যায় ‘গোসল’ অনুচ্ছেদ।

[16]. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮২ ‘ঈমান’ অধ্যায় ‘তাক্বদীরে বিশ্বাস’ অনুচ্ছেদ।

[17]. আহমাদ, মিশকাত হা/১২১ ‘ঈমান’ অধ্যায় ‘তাক্বদীরে বিশ্বাস’ অনুচ্ছেদ।

[18]. আয়াতটি হ’লঃ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِيْنَ. ‘আর যখন তোমার পালনকর্তা বনু আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের সন্তানদের বের করে আনলেন এবং নিজের উপর তাদের প্রতিজ্ঞা করালেন ‘আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই’? তারা বলল, অবশ্যই। ‘আমরা এ বিষয়ে অঙ্গীকার করছি’ আর এটা এজন্য, যাতে তোমরা ক্বিয়ামতের দিন একথা বলতে না পারো যে, বিষয়টি আমাদের জানা ছিল না’ (আ‘রাফ ৭/১১২)।

[19]. মালেক, আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৯৫ ‘ঈমান’ অধ্যায় ‘তাক্বদীরে বিশ্বাস’ অনুচ্ছেদ।

[20]. আহমাদ, মিশকাত হা/১১৯ ‘তাক্বদীরে বিশ্বাস’ অনুচ্ছেদ।

[21]. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৯০ ‘ঈমান’ অধ্যায়, ‘তাক্বদীরে বিশ্বাস’ অনুচ্ছেদ।

[22]. যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, على فطرة الاسلام ‘ইসলামের উপর’ ছহীহ ইবনু হিববান হা/১৩২; শু‘আয়েব আরনাঊত্ব বলেন, রাবীগণ সকলে বিশ্বস্ত।

[23]. মুসলিম হা/২৮৬৫ ‘জান্নাতের বিবরণ’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ১৬; আহমাদ হা/১৬৮৩৭।

[24]. আলবানী, ছহীহ তিরমিযী হা/১২২৪; মিশকাত হা/৪১৫৭ ‘আক্বীক্বা’ অনুচ্ছেদ।

[25]. আহমাদ, মওকূফ ছহীহ, মারফূ হুকমী, মিশকাত হা/১২২ ‘তাক্বদীরে বিশ্বাস’ অনুচ্ছেদ।

[26]. মায়েদাহ ৫/৮২; ক্বাছাছ ২৮/৫২-৫৪; ঐ, তাফসীর ত্বাবারী ২০/৫৬ পৃ: ; তাফসীর ইবনু কাছীর; ত্বাবারী ৩২+৮=৪০ জন এবং ইবনু কাছীর ৭০ জন বলেছেন।

[27]. মুফতী মুহাম্মাদ শফী, তাফসীর মা‘আরেফুল কুরআন (বঙ্গানুবাদ সংক্ষেপায়িত : মদীনা ত্বাইয়েবা ১৪১৩/১৯৯৩), পৃঃ ৩৪০।

[28]. বাক্বারাহ ২/৩০; আন‘আম ৬/১৬৫; ফাত্বির ৩৫/৩৯।

[29]. মুসলিম, হা/১৯২০ ‘নেতৃত্ব’ অধ্যায়।

[30]. তিরমিযী হা/৩৫২২ ‘তাফসীর’ অধ্যায় সূরা রহমান; সনদ হাসান, সিলসিলা ছহীহাহ হা/২১৫০।

[31]. তাসফীর মা‘আরেফুল কুরআন পৃঃ ৬২৯।

[32]. তাফসীর ইবনু কাছীর, মায়েদাহ ২৭-৩১ আয়াত; গৃহীত। তাফসীর ইবনু জারীর, আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ’তে, সনদ জাইয়িদ।

[33]. ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তাবি) ১/৮৭ পৃঃ।

[34]. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/৮৭ পৃঃ।

[35]. আবুদাঊদ হা/৪২৫৭, ৫৯৬২ ‘ফিতান’ অধ্যায়; তিরমিযী হা/২২০৪, ইবনু মাজাহ হা/৩৯৬১ সনদ ছহীহ।

[36]. বুখারী হা/৩৩৩৫; মুসলিম, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ; মিশকাত হা/২১১ ‘ইল্ম’ অধ্যায়।

[37]. বুখারী হা/২৪৪৯; মিশকাত হা/৫১২৬ ‘শিষ্টাচার’ অধ্যায় ‘যুলুম’ অনুচ্ছেদ ২১।

[38]. মুওয়াত্ত্বা, আবুদাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/১৩৫৯; সনদ ছহীহ, ‘ছালাত’ অধ্যায় ‘জুম‘আ’ অনুচ্ছেদ।

[39]. তিরমিযী, মিশকাত হা/১১৮ ‘তাক্বদীরে বিশ্বাস’ অনুচ্ছেদ; সনদ ছহীহ, তিরমিযী হা/৩০৭৬ ‘তাফসীর সূরা আ‘রাফ’। একই হাদীছ মিশকাত হা/৪৬৬২ ‘শিষ্টাচার’ অধ্যায় ‘সালাম’ অনুচ্ছেদে এসেছে। যেখানে ‘আদম তার বয়স থেকে ৬০ বছর দান করেন’ বলা হয়েছে। তিরমিযী হাদীছটিকে ‘হাসান গরীব’ বলেছেন ছাহেবে মিরক্বাত ও ছাহেবে তোহফা উভয়ে বলেন যে, ‘৪০ বছর দান করার হাদীছ অগ্রগণ্য (الأرجح)’ দ্রঃ তুহফাতুল আহওয়াযী হা/৫০৭২-এর ব্যাখ্যা।